

এবং হিমু.....

হুমায়ূন আহমেদ



রাত একটা।

আমার জন্যে এমন কোন রাত না — বলা যেতে পারে রজনীর শুরু। The night has only started. কিন্তু ঢাকা শহরের মানুষগুলি আমার মত না। রাত একটা তাদের কাছে অনেক রাত। বেশির ভাগ মানুষই শুয়ে পড়েছে। যাদের সামনে SSC, HSC বা এ জাতীয় পরীক্ষা তারা বই সামনে নিয়ে ঝিমুচ্ছে। নব বিবাহিতদের কথা আলাদা — তারা জেগে আছে। একে অন্যকে নানান ভঙ্গিমায় অভিভূত করার চেষ্টা করছে।

আমি হাঁটছি। বলা যেতে পারে হন হন করে হাঁটছি। নিশি রাতে সবাই দ্রুত হাঁটে। শুধু পশুরা হাঁটে মন্থর পায়ে। তবে আমার হন হন করে হাঁটার পেছনে একটা কারণ আছে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। কিছু হোটেল-রেস্টুরেন্ট এখনো খোলা। কড়কড়া ভাত, টক হয়ে যাওয়া বিরিয়ানী হয়তবা পাওয়া যাবে। তবে খেতে হবে নগদ পয়সায়। নিশিরাতের খদ্দেরকে কোন হোটেলওয়ালা বিনা পয়সায় খাওয়ায় না। আমার সমস্যা হচ্ছে, আমার গায়ে যে পাঞ্জাবি তাতে কোন পকেট নেই। পকেট নেই বলেই মানিব্যাগও নেই। পকেটহীন এই পাঞ্জাবি আমাকে রূপা কিনে দিয়েছে। খুব বাহারী জিনিশ। পিওর সিল্ক। খোলা গলা, গলার কাছে সূক্ষ্ম সূতার কাজ। সমস্যা একটাই — পকেট নেই। পাঞ্জাবির এই বিরাট ক্রটির দিকে রূপার দৃষ্টি ফেরাতেই সে বলল, পকেটের তোমার দরকার কি !

রূপবতী মেয়েদের সব যুক্তিই আমার কাছে খুব কঠিন যুক্তি বলে মনে হয়। কাজেই আমিও বললাম, তাই তো, পকেটের দরকার কি !

রূপা বলল, তুমি নিজেকে মহাপুরুষ টাইপের একজন ভাব। মহাপুরুষদের পোশাক হবে বাহুল্য বর্জিত। পকেট বাহুল্য ছাড়া কিছু না। আমি আবারো রূপার যুক্তি মেনে নিয়ে হাসিমুখে নতুন পাঞ্জাবি পরে বের হয়েছি — তারপর থেকে না খেয়ে আছি। যখন পকেটে টাকা থাকে তখন নানান ধরনের বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা হয়। তারা চা খাওয়াতে চায়, সিঙ্গাড়া খাওয়াতে চায়। আজ যেহেতু পকেটই নেই, কাজেই এখন পর্যন্ত পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয়নি।

আমার শেষ ভরসা বড় ফুপার বাসা। রাত দেড়টার দিকে কলিংবেল টিপে তাদের ঘুম ভাঙালে কি নাটক হবে তা আগে-ভাগে বলা মুশকিল। বড় ফুপা তাঁর বাড়িতে

আমার যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। কাজেই আমাকে দেখে তিনি খুব আনন্দিত হবেন এ রকম মনে করার কোন কারণ নেই। সম্ভাবনা শতকরা ষাট ভাগ যে, তিনি বাড়ির দরজা খুললেও গ্রীল খুলবেন না। গ্রীলের আড়াল থেকে হুংকার দেবেন — গেট আউট। গেট আউট। পাঁচ মিনিটের ভেতর ক্লিয়ার আউট হয়ে যাও, নয়ত বন্দুক বের করব।

বন্দুক বের করা তাঁর কথার কথা না। ঢাকার এডিশনাল আইজি তাঁর বন্ধুমানুষ। তাঁকে দিয়ে তিনি সম্প্রতি বন্দুকের একটা লাইসেন্স করিয়েছেন এবং আঠারো হাজার টাকা দিয়ে টুটু বোরের রাইফেল কিনেছেন। সেই রাইফেল তাঁর এখনো ব্যবহার করার সুযোগ হয়নি। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় আছেন।

বাকি থাকেন সুরমা ফুপু। সূর্যের চেয়ে বালি গরমের মত, বড় ফুপুর চেয়ে তিনি বেশি গরম। ঢাকার এডিশনাল আইজির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব থাকলে তিনি একটা মেশিনগানের লাইসেন্স নিয়ে ফেলতেন।

তবে ভরসার কথা — আজ বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবারে বড় ফুপা খানিক মদ্যপান করেন। খুব আগ্রহ নিয়ে করেন, কিন্তু তাঁর পাকস্থলী ইসলামীভাবাপন্ন বলে মদ সহ্য করে না। কিছুক্ষণ পর পর তাঁর বমি হতে থাকে। বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে তিনি বলেন — **I am a dead man. I am a dead man.** ফুপু তাঁকে নিয়ে প্রায় সারারাতই ব্যস্ত থাকেন। এই অবস্থায় কলিংবেলের শব্দ শুনলে তাঁরা কেউ দরজা খুলতে আসবেন না, আসবে বাদল। এবং সে একবার দরজা খুলে আমাকে ঢুকিয়ে ফেললে আর কোন সমস্যা হবার কথা না।

বড় ফুপার বাড়ির কাছাকাছি এসে টহল পুলিশের মুখোমুখি হয়ে গেলাম। তারা দলে চারজন। আগে দু'জন দু'জন করে টহলে বেরুত। ইদানীং বোধহয় দু'জন করে বেরুতে সাহস পাচ্ছে না, চারজন করে বের হচ্ছে। আমাকে দেখেই তারা থমকে দাঁড়াল এবং এমন ভঙ্গি করল যেন পৃথিবীর সবচে' বড় ক্রিমিন্যালকে পাওয়া গেছে। দলের একজন (সম্ভবত সবচে' ভীতুজন, কারণ ভীতুরাই বেশি কথা বলে) চেঁচিয়ে বলল, "কে যায়? পরিচয়?"

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, আমি হিমু। আপনারা কেমন আছেন, ভাল?

পুলিশের পুরো দলটাই হকচকিয়ে গেল। খাকি পোশাক পরা মানুষদের সমস্যা হচ্ছে, কুশল জিজ্ঞেস করলে এরা ভড়কে যায়। যে কোন ভড়কে যাওয়া প্রাণীর চেষ্টা থাকে অন্যকে ভড়কে দেয়ার। কাজেই পুলিশদের একজন আমার দিকে রাইফেল বাগিয়ে ধরে কর্কশ গলায় বলল, পকেটে কি?

আমি আগের চেয়েও বিনয়ী গলায় বললাম, আমার পকেটই নেই।

'ফাজলামি করছিস? হারামজাদা! থাবড়া দিয়ে দাঁত ফেলে দেব।'

'দাঁত ফেলতে চান ফেলবেন। পুলিশ এবং ডেনটিস্ট এরা দাঁত ফেলবে না তো কে ফেলবে। তবে দাঁত ফেলার আগে দয়া করে একটু পরীক্ষা করে দেখুন, সত্যিই পকেট

নেই।

একজন পরীক্ষা করার জন্যে এগিয়ে এল। সারা শরীর হাতাপিতা করে বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গীদের একজনকে বলল, ওস্তাদ, আসলেই পকেট নাই।

যাকে ওস্তাদ বলা হয়েছে সে সম্ভবত দলের প্রধান এবং সবচে' জ্ঞানী। সে বলল, মেয়েছেলের পাঞ্জাবি। এই হারামজাদা মেয়েছেলের পাঞ্জাবি পরে চলে এসেছে। মেয়েছেলের পাঞ্জাবির পকেট থাকে না। এই চল, থানায় চল।

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, জ্বি চলুন। আপনারা কোন্ থানার আন্ডারে? রমনা থানা?

পুলিশের দলটা পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেলো। থানায় যাবার ব্যাপারে আমার মত আগ্রহী কোন আসামী তারা বোধহয় খুব বেশি পায় না।

'কি নাম বললি?'

'হিমু।'

'যাস কই?'

'ভাত খেতে যাই।'

'রাত দেড়টায় ভাত খেতে যাস?'

'ভাত সব সময় খাওয়া যায়।'

ওস্তাদ যাকে বলা হচ্ছে সেই ওস্তাদ এগিয়ে আসছে। পেছন থেকে একজন বলল, ওস্তাদ, বাদ দেন। ড্রাগ-ফাগ খায় আর কি। দু'টা থাবড়া দিয়ে চলে আসেন।

ওস্তাদেরও মনে হয় সে রকমই ইচ্ছা। বলে কিক মারার আনন্দ এবং গালে থাবড়া মারার আনন্দ প্রায় কাছাকাছি। টহল পুলিশের ওস্তাদ এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে কেন?

জোরালো একটা থাবড়া খেলাম। চোখে অন্ধকার দেখার মত থাবড়া। মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল। ওরে খাইছেরে বলে চিৎকার দিতে গিয়েও দিলাম না। ওস্তাদ থাবড়া দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, আমি আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, আরেকটা থাবড়া দিয়ে যান, নয়ত খালে পড়ব। খালে পড়লে উপায় নাই, সাঁতার জানি না।

পুলিশের দল থেকে একজন বলল, ওস্তাদ, চলে আসেন।

স্পষ্টতই ওরা ঘাবড়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি ঘাবড়ে গেছেন 'ওস্তাদ'। আমি বললাম, নিরীহ মানুষকে চড়-থাপ্পড় দিয়ে চলে যাবেন এটা কেমন কথা?

ওস্তাদ দলের কাছে চলে যাচ্ছে। আমিও যাচ্ছি তার পেছনে পেছনে, যদিও উল্টো দিকে যাওয়াই নিয়ম। পুলিশের দল যেন কিছু হয়নি এই ভঙ্গিতে হাঁটা শুরু করেছে। আমি ওদের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব রেখে হাঁটছি। তারা আমার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে রাস্তা ক্রস করল। আমিও রাস্তা ক্রস করলাম।

'এই, তুই চাস কি?'

আমি আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, আরেকটা থাপ্পড় দিয়ে দিন, বাসায় চলে যাই।

পুলিশের দল কিছু না বলে আবার হাঁটা শুরু করেছে। আমিও তাদের অনুসরণ করছি। মানুষের ভয় চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়ে, এদেরও বাড়ছে। চারজন পুলিশ, দু'জনের হাতে রাইফেল অথচ ওরা এখন আতংকে আধমরা। আমার মজাই লাগছে। আমি শিষ বাজানোর চেষ্টা করলাম — হচ্ছে না। ক্ষুধার্ত অবস্থায় শিষ বাজে না। পেটে ক্ষুধা নিয়ে গান গাওয়া যায়, শিষ বাজানো যায় না। তবু চেষ্টা করে যাচ্ছি — হিন্দী গানের একটা লাইন শিষে আমি ভালই আনতে পারি — হায় আপনা দিল তো আওয়ারা . . . আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে আছে . . .

শিষ দেবার কারণে ক্ষুধা একটু কম কম লাগছে। বড় ফুপার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। পুলিশের দল হুট করে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল।

আমি প্রায় দৌড়ে গলির মুখে গিয়ে বললাম, ভাইজান, আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। ফির মিলেঙ্গে। এরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। আমার সামান্য বাক্য দু'টির মর্মার্থ নিয়ে তারা চিন্তা-ভাবনা করবে। আজকের রাতের টহল তাদের ভাল হবে না। আজ তারা ছায়া দেখে ভয় পাবে।

বিস্ময়কর ব্যাপার হল — ফুপার বাড়ির প্রতিটি বাতি জ্বলছে। কোন একটা সমস্যা নিশ্চয়ই হয়েছে। আমি সেই সমস্যায় উপস্থিত হয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলব — 'ভাত খাব'। সেই বলাটাও সমস্যা। আজ বোধহয় কপালে ভাত নেই। পুলিশের থাপ্পড় খেয়েই রাত পার করতে হবে। আমি কলিংবেলে হাত রাখলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা খুলে গেল। বড় ফুপা তাঁর ফর্সা ছোটখাট মুখ বের করে ভীত চোখে আমার দিকে তাকালেন। পরক্ষণেই আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, আরে তুই? হিমু? আয় আয়, ভেতরে আয়। এই শোন, হিমু এসেছে, হিমু।

সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে সবাই এক সঙ্গে নেমে আসছে। কিছুক্ষণ আগে পুলিশকে ভড়কে দিয়ে এখন নিজেই ভড়কে যাচ্ছি।

গ্রীলের দরজা খুলতে খুলতে বড় ফুপা বললেন, কেমন আছিস রে হিমু?

'ভাল আছি।'

বাড়ির অন্যরাও চলে এসেছে। আঠারো-উনিশ বছরের একজন তরুণীকে দেখা যাচ্ছে। তরুণী এমনভাবে আমাকে দেখছে যেন আমি আসলে আগ্রার তাজমহল। হেঁটে মালিবাগে চলে এসেছি। ফুপা বললেন, হেন জায়গা নেই তোকে খোঁজা হয়নি। কোথায় ছিলি?

আমি নির্বিকার ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করলাম। নির্বিকার ভঙ্গি ঠিক ফুটল না। আমার জন্যে এই পরিবারটির প্রবল আগ্রহের আসল কারণটা না জানলে সহজ হওয়া যাচ্ছে না। সামথিং ইজ রং, ভেরি রং। বাদল আবার ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। ওর কোন খোঁজ না পেয়ে আমাকে খোঁজা হচ্ছে, যদি আমি কোন সন্ধান বের করে দিই — এই হবে। এ ছাড়া আমার জন্যে এত ব্যস্ততার দ্বিতীয় কোন কারণ

হতে পারে না। আমি এ বাড়ির নিষিদ্ধজন। শুধু আমি নিষিদ্ধ নই, আমার ছায়াও নিষিদ্ধ।

আমি ফুপুর দিকে তাকিয়ে বললাম, বাদল কোথায়? বাদলকে তো দেখছি না। শুয়ে পড়েছে?

ফুপা-ফুপু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। ফুপা বললেন, ও ঘরেই আছে।

'অসুক-বিসুক?'

'না। হিমু তুই বোস, তোর সঙ্গে কথা আছে। চা খাবি?'

'চা অবশ্যই খাব, তবে ভাত-টাত খেয়ে তারপর খাব। ফুপু, রাতে রান্না কি করেছেন? লেফট ওভার নিশ্চয় ডীপ ফ্রীজে রেখে দিয়েছেন?'

ফুপু গম্ভীর গলায় বললেন, আর রান্না-বান্না! দুদিন ধরে ঘরে হাড়ি চড়ছে না।

'ব্যাপারটা কি?'

ফুপা গলা পরিষ্কার করছেন। যেন অস্বস্তির কোন কথা বলতে যাচ্ছেন। ব্যাটারী চার্জ করে নিতে হচ্ছে।

'বুঝলি হিমু, আমাদের উপর দিয়ে বিরাট বিপদ যাচ্ছে। হয়েছে কি, বাদল তার বন্ধুর বোনের বিয়েতে গিয়েছিল। ঐ বিয়ে খেতে গিয়েই কাল হয়েছে — গলায় কাঁটা ফুটেছে।'

'খাসির রেজালা খেয়ে গলায় কাঁটা ফুটবে কি? গলায় হাড় ফুটতে পারে।'

'কাঁটাই ফুটেছে। বেশি কায়দা করতে গিয়ে ওরা বাঙালী বিয়ের আয়োজন করেছে — মাছ ভাত, ডাল দৈ . . . ফাজিল আর কি, বেশি বেশি বাঙালী।'

'বাদলের গলার সেই কাঁটা এখন আর বেরুচ্ছে না?'

'না।'

'ডাক্তার দেখাননি?'

'ডাক্তার দেখাব না! বলিস কি? হেন ডাক্তার নেই যাকে দেখানো হয়নি। আজ সকালেও একজন ই এন টি স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম — হা করিয়ে, চিমটা ঢুকিয়ে নানা কসরত করেছে। কাঁটা অনেক নিচে, চিমটা দিয়ে ধরতে পারছে না। দু'দিন ধরে বাদল খাচ্ছে না, ঘুমুচ্ছে না। কি যে বিপদে পড়েছি!'

'বিপদ তো বটেই।'

'কাঁটা তোলার একটা দোয়া আছে 'নিয়ামুল কোরানে', ঐ দোয়াও তোর ফুপু এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার পড়েছে। কিছুই বাদ নেই।'

'বিড়ালের পায়ে ধরানো হয়েছে?'

তরুণী মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল। পরক্ষণেই শাড়ির আঁচল মুখে চেপে হাসি থামানোর চেষ্টা করল। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, হাসবে না। গ্রামবাংলার মানুষ গত পাঁচশ বছর ধরে কাঁটা ফুটলেই বিড়ালের পায়ে ধরছে। কাজেই এর একটা গুরুত্ব আছেই। কাঁটা হচ্ছে বিড়ালের খাদ্য। আমরা সেই খাদ্য খেয়ে বিড়ালের প্রতি

একটা অবিচার করছি, সেই জন্যে বিড়ালের পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা।

ফুপা থমথমে গলায় বললেন, বিড়ালের পায়েও ধরানো হয়েছে। সেও এক কেলেংকারি। বিড়াল খামচি দিয়ে রক্ত-টক্ত বের করে বিশ্রী কাণ্ড করেছে। এটিএস দিতে হয়েছে। এখন তুই একটা ব্যবস্থা করে দে।

'আমি?'

'হুঁ। বাদলের ধারণা একমাত্র তুই-ই পারবি, আর কেউ পারবে না। তোর ফুপা ওকে কোলকাতায় নিয়ে যেতে চাচ্ছে। ও তোর সঙ্গে দেখা না করে যাবে না। হেন জায়গা নেই যে তোর খোঁজ করা হয়নি। তোকে হঠাৎ আসতে দেখে বুকে পানি এসেছে। দু'টা দিন গেছে — ছেলে একটা-কিছু মুখে দেয়নি। আরো কয়েকদিন এরকম গেলে তো — মরে যাবে।'

ফুপুর কথা শেষ হবার আগেই বাদল ঘরে ঢুকল। চুল উসকু-খুসকু, চোখ বসে গেছে। ঠিকমত দাঁড়াতেও পারছে না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বললাম, খবর কি রে?

বাদল ফ্যাকাসে ভঙ্গিতে হাসল। সাহিত্যের ভাষায় এই হাসির নাম — 'করুণ হাস্য'।

'আমি বললাম, কিরে, শেষ পর্যন্ত মাছের হাতে পরাজিত?'

বাদল তার মুখ আরো করুণ করে ফেলল। আমি বললাম, বসে থাক, ব্যবস্থা করছি। গোসল-টোসল করে খাওয়া-দাওয়া করে নেই, তারপর তোর প্রবলেম ট্যাকল করছি।

বাদলের মুখ মুহূর্তের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে গেলো। তরুণী মেয়েটির ঠোঁটের কোনায় ব্যঙ্গের হাসির আভাস। তবে সে কিছু বলল না। এ বাড়ির পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ আমার অনুকূলে। এ রকম অনুকূল আবহাওয়ার সুযোগ গ্রহণ না করা নিতান্তই অন্যায় হবে। আমি ফুপুর দিকে তাকিয়ে বললাম, গোসল করব। ফুপু, আপনার বাথরুমে হট ওয়াটারের ব্যবস্থা আছে না?

'গীজার নষ্ট হয়ে গেছে। যাই হোক, পানি গরম করে দিচ্ছি। গোসল করে ফেল। গোসল করে ভাত খাবি তো?'

'হুঁ।'

'তাহলে ভাত-টাত যা আছে গরম করতে দেই।'

'ঘরে কি পোলাওয়ের চাল আছে?'

'আছে।'

'তাহলে চট করে পোলাওয়ের কিছু চাল চড়িয়ে দিন। আলু ভাজা করুন। কুচি কুচি করে আলু কেটে ডুবা-তেলে কড়া করে ভাজা। গরম ভাত, আলু ভাজার সঙ্গে এক চামচ গাওয়া ঘি — খেতে একসেলেন্ট হবে। গাওয়া ঘি আছে তো?'

'ঘি নেই।'

'মাখন আছে?'

'হুঁ।'

'অল্প আঁচে মাখন ফুটাতে থাকেন। গাদ যেটা বের হবে ফেলে দেবেন — একেবারে এক নম্বর পাতে খাওয়া ঘি তৈরি হবে। কয়েকটা শুকনা মরিচ ভাজবেন — ঘিয়ের মধ্যেই ভাজবেন।'

'বাদলের কাঁটাটার কিছু করা যায় কি-না দেখ।'

'দেখব। সে দু'দিন যখন অপেক্ষা করেছে আরো ঘন্টাখানিক অপেক্ষা করতে পারবে। পারবি না বাদল?'

বাদল হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। মনে হচ্ছে কথা বলার মত অবস্থাও তার না।

আমি আরেকবার শিষ দিয়ে বাজালাম — হায় আপনা দিল . . .। তরুণী মেয়েটি আমার দিকে তাকাচ্ছে। তার চোখের দৃষ্টিটা কেমন? ভাল না। সেই দৃষ্টিতে কৌতূহল আছে। শুদ্ধ কৌতূহল না, অশুদ্ধ কৌতূহল। মেয়েটি একটা দৃশ্য দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে — সেই দৃশ্য হচ্ছে অতি চালাক একজন মানুষের গলায় দড়ি পড়ার মজাদার দৃশ্য। পুলিশদের মত এই মেয়েটাকেও ভড়কে দিতে পারলে ভাল লাগত, পারছি না। মেয়েরা পুলিশের মত এত সহজে ভড়কায় না। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার নাম কি?

'ইরা।'

'শোন ইরা, তোমার যদি কোন কাঁটার ব্যাপার থাকে, গলায় কাঁটা বা হৃদয়ে কাঁটা তাহলে আমাকে বল, তোমার কাঁটার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব।'

ইরা কঠিন ভঙ্গিতে বলল, আমার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি গোসল করতে যান, আপনাকে গরম পানি দেয়া হয়েছে।

'এত তাড়াতাড়ি তো পানি গরম হওয়ার কথা না।'

'খাওয়ার জন্যে পানি ফুটানো হয়েছে। ঐ পানিই দেয়া হয়েছে।'

'মেনি থ্যাংকস।'

আমি খেতে বসেছি। চেয়ারে বসেই বাদলকে ডাকলাম, বাদল খেতে আয়। বাদলের জন্যে একটা প্লেট দেখি।

ফুপা বললেন, ও তো ঢোকই গিলতে পারছে না। ভাত খাবে কি? তুই তো ওর ব্যাপারটা বুঝতেই পারছিস না।

আমি ফুপাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ডাকলাম — বাদল আয়।

বাদল উঠে এল। আমার আদেশ অগ্রাহ্য করা সবার পক্ষেই সম্ভব। বাদলের পক্ষে না। আমি অন্য সবাইকে সরে যেতে বললাম। খাওয়ার সময় একগাদা লোক তাকিয়ে থাকলে খেয়ে আরাম পাই না। নিজেকে জামাই জামাই মনে হয়।

'বাদল শোন, তোর পেটে খিদে, তুই খেয়ে যাবি। গলায় ব্যথা করবে — করুক।

কিছু যায় আসে না। আপাতত কিছু সময়ের জন্যে গলাটাকে পাত্তা দিবি না। কাঁটা থাকুক কাঁটার মত, তুই থাকবি তোর মত। বুঝতে পারছিস?'

'হুঁ।'

'আরাম করে তুই আমার সঙ্গে ভাত খাবি। ভাত খাওয়ার পর আমরা মিষ্টি পান খাব। তারপর তোর কাঁটা নামানোর ব্যবস্থা করব।'

'হিমু ভাই, আগে করলে হয় না!'

'হয়। আগে করলেও হয় — তাতে কাঁটাটাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। আমরা ফুলকে গুরুত্ব দেব — কাঁটাকে না। ঠিক না?'

'ঠিক।'

'আয়, খাওয়া শুরু করা যাক।'

বাদল ভাত মাখছে। আমি বললাম, শুকনা মরিচ ভাল করে ডলে নে — ঝালের চোটে নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে পানি বেরুবে, তবেই না খেয়ে আরাম। শুরু করা যাক — রেডি সেট গো . . .

বাদল খাওয়া শুরু করল। কয়েক নলা খেয়েই হতভম্ব গলায় বলল, হিমু ভাই, কাঁটা চলে গেছে বলে মনে হচ্ছে!

'চলে গেলে গেছে। এতে আকাশ থেকে পড়ার কি আছে? খাওয়া শেষ কর।'

'ওদের খবরটা দিয়ে আসি?'

'এটা এমন কোন বড় খবর না যে মাইক বাজিয়ে শহরে ঘোষণা দিতে হবে। আরাম করে খা তো। আলু ভাজিটা অসাধারণ হয়েছে না?'

'অমৃত ভাজির মত লাগছে।'

'ঘি দিয়ে চপচপ করে খা, ভাল লাগবে।'

'আজ তুমি না এলে মরেই যেতাম। আমি সবাইকে বলেছি, হিমু ভাই-ই কেবল পারে এই কাঁটা দূর করতে। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না।'

'মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু যায় আসে না। তোর নিজের বিশ্বাসটাই প্রধান।'

'ইরা তো তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছিল।'

'তাই না-কি?'

'হ্যাঁ। আমি যখন বললাম, হিমু ভাই হচ্ছে মহাপুরুষ, তখন হাসতে হাসতে সে প্রায় বিষম খায়। আজ তার একটা শিক্ষা হবে।'

বাদলের চোখে পানি এসে গেছে। ঝালের কারণে চোখের পানি, না আনন্দের পানি সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

একেক ধরনের চোখের পানি একেক রকম হওয়া উচিত ছিল। দুঃখের চোখের পানি হবে এক রকম, আনন্দের পানি অন্য রকম, আবার ঝালের অশ্রু আরেক রকম। প্রকৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আবেগের ব্যবস্থা রেখেছে কিন্তু সব আবেগের প্রকাশ চোখের পানি দিয়ে সেরে ফেলেছে। ব্যাপারটা কি ঠিক হল?

দুঃখের চোখের পানি হবে নীল। দুঃখ যত বেশি হবে নীল রং হবে তত গাঢ়। রাগ এবং ক্রোধের অশ্রু হবে লাল। দুঃখ এবং রাগের মিলিত কারণে যে চোখের পানি তার রঙ হবে খয়েরি। নীল এবং লাল মিশে খয়েরি রঙই তো হয়?

কাঁটা মুক্তির যে আনন্দ এ বাড়িতে শুরু হল তার কাছে বিয়েবাড়ির আনন্দ কিছু না। ফুপু ছেলেকে জড়িয়ে ধরে মরাকান্না শুরু করলেন। বাদল যতই বলে, কি যন্ত্রণা! মা, আমাকে ছাড় তো। তিনি ততই শক্ত করে ছেলেকে জড়িয়ে ধরেন।

ফুপা আনন্দের চোটে তাঁর হুইস্কির বোতল খুলেছেন। আজ বৃহস্পতিবার। এম্নিতেই তাঁর মদ্যপান দিবস। ছেলের সমস্যার জন্যে খেতে পারছিলেন না। এখন ডবল চড়াবেন। ফুপা যে দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছেন সংস্কৃত কবিরা সেই দৃষ্টিকে বলেন "প্রেম-নয়ন"।

শুধু ইরার চোখ কঠিন। পাথরের চোখেও সামান্য তরল ভাব থাকে। তার চোখে তাও নেই।

রাতে ফুপার বাড়িতে থেকে গেলাম। আজ আমার থাকার জায়গা হল গেস্ট রুমে। এই বাড়ির গেস্ট রুম তালাবদ্ধ থাকে। বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর গেস্ট এলেই শুধু তালা খোলা হয়। আজ আমি বিশেষ শ্রেণীর একজন গেস্ট। ঘুমুতে যাবার আগে আগে আমার জন্যে কফি চলে এল। এটিও বিশেষ ব্যবস্থার একটা অঙ্গ। কফি নিয়ে এল ইরা। ইরা সম্পর্কে এ পর্যন্ত তথ্য যা সংগ্রহ করেছি তা হচ্ছে — মেয়েটা শামসুন্নাহার হলে থেকে পড়ে। তার অনার্স ফাইন্যাল পরীক্ষা। হলে পড়াশোনার সমস্যা হচ্ছে, তাই এ বাড়িতে চলে এসেছে।

ফুপার খালাতো ভাইয়ের বড় মেয়ে। দারুণ নাকি ব্রিলিয়ান্ট। না পড়লেও না-কি ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হবে। তারপরেও পড়ছে, কারণ রেকর্ড মার্ক পেতে চায়।

ইরা কফির কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, আপনার ধারণা, আজ আপনি আপনার বিশেষ এক অলৌকিক ক্ষমতা দেখালেন?

আমি কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বললাম, তোমার সে রকম ধারণা না?

'অবশ্যই না। বাদলের আপনার উপর অগাধ বিশ্বাস। আপনাকে দেখে সে রিলাক্সড বোধ করেছে। সহজ হয়েছে। ভয়ে-আতংকে তার গলার মাংসপেশী শক্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই ভাবও দূর হয়েছে। তারপর আপনি তাকে ভাত খাওয়ালেন। সহজেই কাঁটা বের হয়ে এল, আমি কি ভুল বলছি?'

'না, ভুল হবে কেন!'

'নিতান্তই লৌকিক একটা ব্যাপার করে আপনি তাতে একটা অলৌকিক ফ্লেবার দিয়ে ফেলেছেন — এটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'আমি কোন ফ্লেবার দেইনি ইরা, এটা তুমি কল্পনা করছ।'

'আপনি না দিলেও অন্যরা দিচ্ছে। বাদল দিচ্ছে। আপনার ফুপা–ফুপু দিচ্ছেন।'

'তাতে ক্ষতি তো হচ্ছে না। তোমার মত যারা বুদ্ধিমান তারা ঠিকই আসল ব্যাপারটা ধরতে পারছে।'

ইরা কঠিন গলায় বলল, আমাদের সমাজে কিছু কিছু প্রতারক আছে, যারা হাত দেখে, গ্রহ–নক্ষত্র বিচার করে, পাথর দেয়, মন্ত্র–তন্ত্র পড়ে — আপনি কি তাদের চেয়ে আলাদা? আপনি আলাদা না, আপনি তাদের মতই একজন।

'হতে পারে। কিন্তু তুমি আমার উপর এত রেগে আছ কেন?'

'আপনি যে শুরু থেকেই আমাকে তুমি তুমি করে বলছেন — সেটাও আমার খারাপ লাগছে। আমি তো স্কুলে পড়া বাচ্চা মেয়ে না। আপনি আমাকে চেনেনও না। প্রথম দেখাতেই আপনি আমাকে তুমি বলবেন কেন?'

'ভুল হয়েছে। একবার যখন বলে ফেলেছি সেটাই বহাল রাখি। মানুষ আপনি থেকে তুমিতে যায়। তুমি থেকে আপনিতে যায় না। নিয়ম ভাঙা কি ঠিক হবে?'

'আমার বেলায় নিয়মটা ভাঙলেই আমি খুশি হব।'

'এখন থেকে আপনি করে বলব।'

'ধন্যবাদ। আরেকটা কাজ কি দয়া করে করবেন?'

'অবশ্যই করব। বলুন।'

'বাদলকে ডেকে একটু কি বুঝিয়ে বলবেন তার গলার কাঁটাটা কি ভাবে গেল? ওর মন থেকে আধিভৌতিক ব্যাপারগুলি দূর করা দরকার। আপনি বুঝিয়ে বলে দিন। আমার বলায় সে কনভিন্সড হবে না। আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে আসি।'

'জ্বি আচ্ছা, নিয়ে আসুন।'

ইরা বাদলকে নিয়ে ঢুকল। আমি বললাম, বাদল, তুই স্থির হয়ে আমার সামনের চেয়ারটায় বোস। মিস ইরা, আপনিও বসুন। তবে আপনাকে স্থির হয়ে না বসলেও চলবে। আপনি ইচ্ছা করলে নড়াচড়া করতে পারেন।

ইরা তাকাচ্ছে তীব্র চোখে। আমি তার সেই চোখ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বাদলের দিকে তাকিয়ে বললাম, বাদল শোন্, তুই যদি ভেবে থাকিস আমি আমার মহা ক্ষমতাবলে তোর গলার কাঁটা গলিয়ে ফেলেছি, তাহলে তুই বোকার স্বর্গে বাস করছিস। কি ভাবে সেই ঘটনা ঘটল তা ইরা খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে দেবে। ব্যাখ্যা শুনে তারপর ঘুমুতে যাবি। তার আগে না। মনে থাকবে?

'থাকবে।'

'যা ভাগ।'

বাদল হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়েছে। ইরা এখনো তীব্র চোখে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে সে খুব অপমানিত বোধ করছে। মেয়েটা সুন্দর। এরকম সুন্দর একটা মেয়ে ফিজিক্স পড়ছে কেন? ফিজিক্স পড়বে শুকনা রস কষহীন মেয়েগুলি। ইরার পড়া উচিত ইংরেজি কিংবা বাংলা সাহিত্য।

আমি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ফোম বিছানো গদি — আরামের বিছানা। এত আরামের বিছানায় কি ঘুম আসবে?

'হিমু জেগে আছিস?'

ফুপার জড়ানো গলা। ইতিমধ্যেই তিনি উঁচু তারে নিজেকে বেঁধে ফেলেছেন বলে মনে হচ্ছে। ফুপাকে ঘরে ঢোকানো এখন বিপদজনক হবে। তিনি উঁচু থেকে উঁচুতে চড়তে থাকবেন, তারপর সেখান থেকে ধপাস করে নিচে নামবেন, বমি করে ঘর ভাসাবেন।

'হিমু, হিমু!'

'জ্বি।'

'তোর সঙ্গে কিছু গল্প গুজব করা যাক — ম্যান টু ম্যান টক। তুই আজ ভালই ভেল্কি দেখালি। দরজা খোল। হিমু, হিমু।'

মাতাল দরজা খোলাতে চাইলে খুলিয়ে ছাড়বে। ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান করতেই থাকবে। কাজেই দরজা খুললাম। বড় ফুপা গ্লাস এবং বোতল হাতে ঢুকে পড়লেন।

'তোর ফুপু ঘুমিয়ে পড়েছে। খুব টেনশনে গেছে তো, এখন আরামে ঘুমুচ্ছে। আমি ভাবলাম 'কন্টক–মুক্তিটা' সেলিব্রেট করা যাক। কন্টক–মুক্তি শব্দটা কেমন লাগছে?

'ভাল লাগছে।'

'কন্টক মুক্তির ইংরেজী কি হবে? "Freedom from thorn?"

'ফুপা আপনি দ্রুত চালাচ্ছেন। আমার মনে হয় এখন উচিত শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া।'

'তোর সঙ্গে গল্প করতে এসেছি। গল্প করতে ভাল লাগছে। আমার ধারণা তোর উপর ইনজাসটিস করা হয়েছে। তোকে যে আমি বা তোর ফুপু দেখতে পারি না এটা অন্যায়। ঘোরতর অন্যায়। তোর অপরাধ কি? আমি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট ভেবেছি। তোর নেগেটিভ দিকগুলি কি —

এক, তোর চাকরি বাকরি নেই। এটা কোন ব্যাপার না, পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক আছে যাদের চাকরি নেই।

দুই, তুই পথে পথে ঘুরিস। এটা কোন অপরাধ হতে পারে না। এটা আপরাধ হলে পৃথিবীর সব পর্যটকরাই অপরাধী।

'আর খাবেন না ফুপা।'

'কথার মাঝখানে কথা বলিস না হিমু। আমি কি যেন বলছিলাম?'

'পর্যটকদের সম্পর্কে কি যেন বলছিলেন।'

'কোন পর্যটক? হিউয়েন সাং? হিউয়েন সাং এর কথা খামাখা বলব কেন?'

'আর না খেলে হয় না ফুপা?'

'হয়। হবে না কেন? তবে আনন্দ পরিপূর্ণ হয় না। হিউয়েন সাং–এর কথা কি

বলছিলাম?'

'আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

'শোন হিমু, তুই লোক খারাপ না। এবং তোর ক্ষমতা আছে। বাদল যে তোর নাম বলতে অজ্ঞান হয়ে যায়, বাদলের কোন দোষ নেই। **I Like You Himu.**'

'থ্যংক ইউ ফুপা।'

'তোর একটাই অপরাধ তুই শুধু হাঁটিস। এই অপরাধ ক্ষমা করা যায়। হিউয়েন সাংওতো হেঁটেছে। এই দেখ আবার হিউয়েন সাং-এর কথা চলে এসেছে। বারবার এই নাক চ্যাপ্টা চাইনীজটার কথা কেন বলছি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ফুপা চোখ মুখ উল্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তারপর হড়হড় শব্দ হতে লাগল।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আমার কিছু করার নেই। ফুপা বিছানাতে বসেছিলেন। বিছানা এবং আমার শরীরের এক অংশ তিনি ভাসিয়ে ফেলেছেন। বিড় বিড় করে বলছেন, **"I am a dead man, I am a dead man."**



বদরুল সাহেব আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, কোথায় ছিলেন এতদিন?

তাঁর গলা মোটা, শরীর মোটা, বুদ্ধিও মোটা। আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি প্রশস্ত মানুষের অন্তরও প্রশস্ত হয়। বদরুল সাহেবের অন্তর প্রশস্ত, মনে মায়াভাব প্রবল। আমি ছ'-সাত দিন ধরে মেসে আসছি না। কেউ হয়ত ব্যাপারটা লক্ষ্যই করেনি। তিনি ঠিকই লক্ষ্য করেছেন। আমাকে দেখে তিনি যে উল্লাসের ভঙ্গি করলেন সেই উল্লাসে কোন খাদ নেই।

'কোথায় ছিলেন রে ভাই?'

আমি হাসলাম। অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর আমি ইদানীং হেসে দেবার চেষ্টা করছি। একেক ধরনের প্রশ্নের উত্তরে একেক ধরনের হাসি। এখন যে হাসি হাসলাম তার অর্থ হচ্ছে — আশেপাশেই ছিলাম।

বদরুল সাহেব বললেন, গত বৃহস্পতিবারে মেসে ফিস্ট হল। বিরাট খাওয়া-দাওয়া। পোলাও, খাসির রেজালা সালাদ। খাসির মাংস আমি নিজে কিনে এনেছিলাম। একটা আস্ত খাসি দেখিয়ে বললাম, হাফ আমাকে দাও, নো হাংকি-পাংকি।

'হাফ দিয়েছিল?'

'দিবে না মানে? মাংস কেটে আমার সামনে পিস করতে চায়। আমি বললাম, খবর্দার, আগে ওজন করে তারপর পিস করবে।'

'আগে পিস করলে অসুবিধা কি?'

'আগে পিস করতে দিলে উপায় আছে? ফস করে বাজে গোসত মিক্স করে ফেলবে। কিছু বুঝতেই পারবেন না। ম্যাজিক দেখিয়ে দেবে। খাসির গোশত কিনে নিয়ে রান্না করার পর খেতে গিয়ে বুঝবেন পাঁঠার গোশত। মিস্টার পাঁঠা।'

বদরুল সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা মেসের সিঁড়িতে, তিনি বেরুচ্ছিলেন। আমাকে দেখে আমার পেছনে পেছনে ঘরে এসে ঢুকলেন। ফিস্টের ব্যাপারটা না বলে তিনি শান্তি পাবেন না। গোশত কেনা থেকে যে গল্প শুরু হয়েছে সেই গল্প শেষ হবে খাওয়া কিভাবে হল সেখানে। আমি ধৈর্য নিয়ে গল্প শোনার প্রস্তুতি নিচ্ছি। খাওয়া-দাওয়ার যে কোন গল্পে ভদ্রলোকের অসীম আগ্রহ। এত আনন্দের সঙ্গে তিনি খাওয়ার গল্প করেন যেন এই পৃথিবী সৃষ্টিই হয়েছে খাওয়ার জন্যে। খাওয়া ছাড়াও যে গল্প করার আরো

বিষয় থাকতে পারে ভদ্রলোক তা জানেন না।

'খুব চর্বি হয়েছিল। গোশতের ভাজে ভাজে চর্বি।'

'বাহ্‌, ভাল তো।'

'চর্বিদার গোশত রান্না করা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট। বাবুর্চি করে কি — যেহেতু চর্বি বেশি, তেল দেয় কম। এটা খুব ভুল। চর্বিদার গোশতে তেল লাগে বেশি।'

'জানতাম না তো!'

'অনেক ভাল ভাল বাবুর্চিই ব্যাপারটা জানে না। রান্না তো খুব সহজ ব্যাপার না। আমি নিজে বাবুর্চির পাশে বসে রান্না দেখিয়ে দিলাম।'

'খেতে কেমন হয়েছিল?'

'আমি নিজের মুখে কি বলব — আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। চেখে দেখবেন।'

'রেখে দিয়েছেন মানে? বৃহস্পতিবার ফিস্ট হয়েছে, আজ হল শনিবার।'

'দুই বেলা গরম করেছি। নিজের হাতেই করেছি। অন্যের কাছে এইসব দিয়ে ভরসা পাওয়া যায় না। ঠিকমত জ্বাল দেবে না। মাংস টক হয়ে যাবে। বসুন, আমি নিয়ে আসছি।'

তিনি আনন্দিত মুখে গোশত আনতে গেলেন। আজ দিনটা মনে হয় ভালই যাবে। সকালে ভরপেট খেয়ে নিলে সারাদিন আর খাওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। বড় ফুপার বাসা থেকে ভোরবেলা বের হয়েছি। সবাই তখনো ঘুমে। কাজের মেয়েটা জেগে ছিল। সেই দরজা খুলে দিল। বেরিয়ে আসার সময় টুক করে এক কদমবুসি। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ব্যাপার কি?

সে নিচু স্বরে বলল, খাস দিলে আফনে এট্টু দোয়া করবেন ভাইজান। আমার মাইয়াটা বহুত দিন হইছে নিখোঁজ।

'বল কি? কতদিন হয়েছে নিখোঁজ।'

'তা ধরেন গিয়া দুই বচ্ছর হইছে। এক বাড়িত কাম করত। এরা মাইর-ধইর করতো — একদিন বাড়ি থাইক্যা পালাইয়া গেছে। আর কোন খুঁইজ নাই।'

সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে যাদের বাস তাদের আবেগ-টাবেগ বোধহয় কম থাকে। দু'বছর ধরে মেয়ে নিখোঁজ এই সংবাদ সে দিচ্ছে সহজ গলায়। যেন তেমন কোন বড় ব্যাপার না।

'নাম কি তোমার মেয়ের?'

'লুৎফুন্নেসা। লুৎফা ডাকি।'

'বয়স কত?'

'ছোট মাইয়া, সাত-আট বছর। ভাইজান, আফনে এট্টু চেষ্টা নিলে মেয়েটারে ফিরত পাই। মেয়ে ঢাকা শহরেই আছে।'

'জান কি করে ঢাকা শহরে আছে?'

'আয়না পড়া দিয়া জানছি। ধনখালির পীর সাব আয়না পড়া দিয়া পাইছে। অখন

আফনে একটু চেষ্টা নিলে . . .'

'আচ্ছা দেখি।'

সে আবার একটা কদমবুসি করে ফেলল।

সকালের শুরুটা হল কদমবুসির মাধ্যমে। শুরু হিসেবে মন্দ না। সাধু-সন্ন্যাসীর স্তরে পৌঁছে যাচ্ছি কি-না বুঝতে পারছি না। সাধু-সন্ন্যাসীরা পায়ের পবিত্র ধূলি বিতরণের মাধ্যমে সকাল শুরু করেন। তারপরের অংশে ভুরি ভোজন, ঘি, হালুয়া, পরোটা মাংস।

বদরুল সাহেব তাঁর বিখ্যাত খাসির গোশতের বাটি নিয়ে এসেছেন। গোশত বলে সেখানে কিছু নেই। জ্বালের চোটে সব গোশত গলে কালো রঙের ঘন স্যুপের মত একটা বস্তু তৈরি হয়েছে। চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলা যায়। তবে বদরুল সাহেবের বিবেচনা আছে। তিনি সঙ্গে চায়ের চামচ এনেছেন। আমি সেই চামচে তরল খাসির মাংস এক চুমুক মুখে দিয়ে বললাম, অসাধারণ! রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার কাছাকাছি।

বদরুল সাহেব উজ্জ্বল মুখ করে বললেন, বাসি হওয়ায় টেস্ট আরো খুলেছে, তাই না? গোছতের ঐ মজা যত বাসি তত মজা। টেস্ট খুলেছে না?

'খুলেছে বললে কম বলা হয়। একেবারে ডানা মেলে দিয়েছে।'

'গরম গরম পরোটা দিয়ে খেলে আরো আরাম পেতেন। আপনি একটু ওয়েট করুন, আমি দৌড় দিয়ে দু'টা পরোটা নিয়ে আসি। সাড়ে ছ'টা বাজে, মোবারকের স্টলে পরোটা ভাজা শুরু করেছে।'

'পরোটা আনার কোন দরকার নেই। আপনি আরাম করে বসুন তো। বরং এক কাজ করুন, আরেকটা চামচ নিয়ে আসুন, দু'জনে মিলে মজা করে খাই।'

'না না, অল্পই আছে।'

'নিয়ে আসুন তো চামচ। ভাল জিনিস একা খেয়ে আরাম নেই।'

'এটা একটা সত্য কথা বলেছেন।'

বদরুল সাহেব চামচ আনতে গেলেন। ভদ্রলোকের জন্যে আমার মায়া লাগছে। গত দু'মাস ধরে তাঁর কোন চাকরি নেই। ইনসুরেন্স কোম্পানীতে ভাল চাকরি করতেন। ইন্সপেক্টর জাতীয় কিছু। কোম্পানী তারা তাকে ছাঁটাই করে দিয়েছে। এই বয়সের একজন মানুষের চাকরি চলে গেলে আবার চাকরি জোগাড় করা কঠিন। ভদ্রলোক কিছু জোগাড় করতে পারছেন না। মেসের ভাড়া তিন মাস বাকি পড়েছে। যতদূর জানি, মেসের খাওয়াও তাঁর বন্ধ। ফিস্টে তার নাম থাকার কথা না, বাজার-টাজার করে দিয়েছেন, রান্নার সময় কাছে থেকেছেন এই বিশেষ কারণে হয়ত তাঁর খাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

চামচ নিয়ে এসে বদরুল সাহেব আরাম করে খাচ্ছেন। তাঁকে দেখে এই মুহূর্তে মনে

করার কোন কারণ নেই যে, পৃথিবীতে নানান ধরনের দুঃখ-কষ্ট আছে। যুদ্ধ চলছে বসনিয়ায়। রুয়ান্ডায় অকারণে একজন আরেকজনকে মারছে। তাঁর নিজের সমস্যাও নিশ্চয়ই অনেক। দু'মাস বাড়িতে মনিঅর্ডার যায়নি। বাড়ির লোকজন নিশ্চয়ই আতংকে অস্থির হচ্ছে। ভদ্রলোক নির্বিকার।

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি।'

'হাড়গুলি চুষে চুষে খান, মজা পাবেন। ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'Nearer the bone, sweeter is the meat.'

আমি একটা হাড় মুখে ফেলে চুষতে লাগলাম।

তিনিও একটা মুখে নিলেন। আনন্দে তাঁর চোখ প্রায় বন্ধ।

'বদরুল সাহেব!'

'জ্বি।'

'চাকরি-বাকরির কিছু হল?'

'এখনো হয়নি, তবে ইনশাআল্লাহ্ হবে। আমার অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনা। এদের বলেছি — এরা আশা দিয়েছে।'

'শুধু আশার উপর ভরসা করাটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'আমার খুব ক্লোজ একজনকে বলেছি। ইস্টার্ন গার্মেন্টস-এর মালিক। ইস্কুলে এক সঙ্গে পড়েছি। এখন রমরমা অবস্থা। গাড়ি-টাড়ি কিনে হুলস্থূল। বাড়ি করেছে গুলশানে।'

'তিনি কি আশা দিয়েছেন?'

'পরে যোগাযোগ করতে বলেছে। সেদিনই সে হংকং যাচ্ছিল। দারুণ ব্যস্ত। কথা বলার সময় নেই। এর মধ্যেই সে পেস্ট্রি কোক খাইয়েছে। পূর্বাণীর পেস্ট্রি, স্বাদই অন্য রকম। মাখনের মত মোলায়েম। মুখের মধ্যেই গলে যায়। চাবাতে হয় না।'

'আপনার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু?'

'বললাম না স্কুল-জীবনের বন্ধু। নাম হল গিয়ে আপনার ইয়াকুব। স্কুলে সবাই ডাকত — বেকুব।'

'আসলেই বেকুব?'

'তখন তো বেকুবের মতই ছিল। তবে স্কুল-জীবনের স্বভাব-চরিত্র দেখে কিছু বোঝা যায় না। আমাদের ফার্স্ট বয় ছিল রশিদ। আরে সর্বনাশ, কি ছাত্র! অংকে কোন দিন ১০০-র নিচে পায় নাই। প্রিটেস্ট পরীক্ষায় এক্সট্রা ভুল করেছে। সাত নাম্বার কাটা গেছে। কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিল। সেই রশিদের সঙ্গে একুশ বছর পর দেখা। গাল-টাল ভেঙে, চুল পেকে কি অবস্থা! চশমার একটা ডাণ্ডা ভাঙা, সুতা দিয়ে কানের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। দেখে মনটা খারাপ হল।'

'অংকে একশ পাওয়া ছেলের এই অবস্থা, মন খারাপ হবারই কথা। অংকে টেনে-

টুনে পাশ করলে কানে সুতা বেঁধে চশমা পরতে হত না।'

'কারেক্ট বলেছেন। একুশ বছর পর দেখা — কোথায় কুশল জিজ্ঞেস করবে, ছেলেমেয়ে কতবড় এইসব জিজ্ঞেস করবে — তা না, ফট করে একশ' টাকা ধার চাইল।'

'ধার দিয়েছেন?'

'কুড়ি টাকা পকেটে ছিল, তা-ই দিলাম। খুশি হয়ে নিয়েছে।'

'মেসের ঠিকানা দেননি তো? মেসের ঠিকানা দিয়ে থাকলে মহা বিপদে পড়বেন। দু'দিন পরে পরে টাকার জন্যে বসে থাকবে। আপনার জীবন অতিষ্ঠ করে ফেলবে।'

বদরুল সাহেব দুঃখিত গলায় বললেন, স্কুল-জীবনের বন্ধু তো — দুরবস্থা দেখে মনটা এত খারাপ হয়েছে, আমার নিজের চোখে প্রায় পানি এসে গিয়েছিল। সুতা দিয়ে কানের সাথে চশমা বাঁধা —

বদরুল সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর নিজের ভবিষ্যতের চেয়ে বন্ধুর ভবিষ্যতের চিন্তায় তাঁকে বেশি কাতর বলে মনে হল।

'হিমু ভাই!'

'জ্বি।'

'ভাল একটা নাশতা হয়ে গেল, কি বলেন?'

'হ্যাঁ, হয়েছে। আপনি যে কষ্ট করে আমার অংশটা জমা করে রেখেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ।'

'আরে ছিঃ ছিঃ! এটা একটা ধন্যবাদের বিষয় হল? এতদিন পর ফিস্ট হচ্ছে আপনি বাদ পড়বেন এটা কেমন কথা? তাছাড়া আপনি যেদিন মেসে খান না সেদিনের খাওয়াটা আমি খেয়ে ফেলি।'

'ভাল করেন। অবশ্যই খেয়ে ফেলবেন। দেশে টাকা পাঠিয়েছেন?'

'গত মাসে পাঠিয়েছি। এই মাস বাদ পড়ে গেল। তবে সমস্যা হবে না, আমার স্ত্রী খুবই বুদ্ধিমতী মহিলা — সে ব্যবস্থা করে ফেলবে।'

'আপনার চাকরি যে নেই সেই খবর স্ত্রীকে জানিয়েছেন?'

'জ্বি-না। আপনার ভাবী মনটা খারাপ করবে। কি দরকার! চাকরি তো পাচ্ছিই, মাঝখানে কিছুদিনের জন্যে টেনশানে ফেলে লাভ কি? আজই ইয়াকুবের সঙ্গে দেখা করব। সংস্কৃতে একটা কথা আছে না — "শুভস্য শীঘ্রম"। চা খাবেন হিমু ভাই?'

'জ্বি-না। দরজা-টরজা বন্ধ করে লম্বা ঘুম দেব। আমার স্বভাব হয়ে গেছে বাদুরের মত। দিনে ঘুমাই রাতে জেগে থাকি।'

'কাজটা ঠিক হচ্ছে না ভাই সাহেব। শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শরীর নষ্ট হলে — মন নষ্ট হয়। আমার শরীরটা ঠিক আছে বলেই এত বিপদে-আপদেও মনটা ঠিক আছে। শরীরটা ঠিক রাখবেন।'

'আমার আবার উল্টা নিয়ম। মনটাকে ঠিক রাখি যাতে শরীর ঠিক থাকে।'

বদরুল সাহেব বাটি এবং চামচ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, ছোট্ট একটা কাজ করে দেবেন হিমু ভাই!

'জ্বি, বলুন।'

'মেসের ম্যানেজার আমাকে বলেছে সোমবারের মধ্যে মেস ছেড়ে দিতে। আজেবাজে সব কথা। গালাগালি। আপনি যদি একটু বলে দেন! ও আপনাকে মানে।'

'আমি এক্ষুনি বলে দিচ্ছি।'

'তাকে বললাম যে চাকরি হয়ে যাচ্ছে। ইয়াকুবকে বলেছি। এত বড় গার্মেন্টস–এর মালিক। চাকরি তার কাছে কিছুই না। সে একটা নিঃশ্বাস ফেললে দশটা লোকের এমপ্লয়মেন্ট হয়ে যায়। বিশ্বাস করে না। আপনি বললে বিশ্বাস করবে।'

আমাদের ম্যানাজারের নাম হায়দার আলি খাঁ। নামের সঙ্গে তার চেহারার কোন সঙ্গতি নেই। রোগা, বেঁটে একজন মানুষ। বেঁটেরা সচরাচর কুঁজো হয় না। তিনি খানিকটা কুঁজো। ব্যক্তিবিশেষের সামনে তার কুঁজোভাব প্রবল হয়। আমি সেই ব্যক্তিবিশেষের একজন। তিনি কোন কারণ ছাড়াই আমাকে ভয় পান।

হায়দার আলি খাঁ চেয়ারে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। পিরিচে করে চা খাচ্ছে। ঐ লোককে আমি কখনো চায়ের কাপে করে চা খেতে দেখিনি। আমি কাছে এসে হাসিমুখে বললাম, ভাই সাহেব, খবর কি?

ভদ্রলোক যেভাবে চমকালেন তাতে মনে হল, সাত রেক্টার স্কেলের একটা ভূমিকম্প হয়ে গেছে। পিরিচের সব চা তাঁর জামায় পড়ে গেল। আমি বললাম, করছেন কি?

'চা খাচ্ছি স্যার।'

'খুব ভাল। বেশি বেশি করে চা খান। রিসার্চ করে নতুন বের করেছে — দৈনিক যে সাত কাপ চা খায় তার হার্টের আর্টারি কখনো ব্লক হয় না।'

'থ্যাংক য়্যু, স্যার।'

যেভাবে তিনি থ্যাংক য়্যু বললেন তাতে ধারণা হতে পারে হার্টের আর্টারি সংক্রান্ত রিসার্চটা আমার করা। আমি অবসর সময়ে মেসের ঘরের দরজা বন্ধ করে রিসার্চ করেছি।

'বদরুল সাহেবকে নাকি নোটিশ দিয়ে দিয়েছেন — কথা কি সত্যি?'

'জ্বি। তিন মাসের রেন্ট বাকি। আর নানান যন্ত্রণা করে। বোর্ডাররা নালিশ করেছে।'

'কি যন্ত্রণা করেছে?'

'রান্নার সময় বাবুর্চির পাশে বসে থাকে। ফিস্ট হয়েছে, ত্রিশ' টাকা করে চাঁদা। একটা পয়সা দেয় নাই — ফিস্ট খেয়ে বসে আছে।'

'চাঁদা না দিলেও খাটাখাটনি তো করেছে। গোশত কিনে আনা, খাসির গোশত যে-কেউ কিনতে পারে না। খুবই জটিল ব্যাপার। খাসি ভেবে কিনে এনে রান্নার পর প্রকাশ

পায় পাঁঠা।'

হায়দার আলি খাঁ তাকাচ্ছেন। আমার কথাবার্তার ধরন বুঝতে পারছেন না। কি বলবেন তাও গুছিয়ে উঠতে পারছেন না।

'ম্যানেজার সাহেব।'

'জ্বি স্যার।'

'বদরুল সাহেবকে আর কিছু বলবেন না।'

'তিন মাসের রেন্ট বাকি পড়ে গেছে। অন্য পার্টিকে কথা দিয়ে ফেলেছি। মানুষের কথার একটা দাম আছে। ঠিক না স্যার?'

'ঠিক তো বটেই। কথার দাম আগে যা ছিল মুদ্রাস্ফীতির কারণে সেই দাম আরো বেড়েছে। তবু একটা ব্যবস্থা করুন। এক মাসের মধ্যে সব পেমেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে।'

'কিভাবে হবে? শুনেছি উনি ছাঁটাই হয়ে গেছেন। অফিসের পাওনা টাকাপয়সাও দিচ্ছে না। টাকাপয়সার কি না-কি গণ্ডগোল আছে।'

'গণ্ডগোল তো থাকবেই। পৃথিবীতে বাস করবেন আর গণ্ডগোলে পড়বেন না, তা তো হয় না। এই গণ্ডগোল নিয়েই বাস করতে হবে। উপায় কি? মনে থাকবে তো কি বললাম?'

'জ্বি স্যার।'

আমি ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। ম্যানেজার অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জ্বি স্যার বলেছে বলেই ঠিক ভরসা পাচ্ছি না। বিনয়ের বাড়াবাড়িটাই সন্দেহজনক। আমার নিজের ধারণা বিনয় ব্যাপারটা পৃথিবী থেকে পুরোপুরি উঠে গেলে পৃথিবীতে বাস করা সহজ হত। বিনয়ের কারণে সত্য-মিথ্যা প্রভেদ করা সমস্যা হয়। মিথ্যার সঙ্গে বিনয় মিশিয়ে দিলে সেই মিথ্যা ধরার কারো সাধ্য থাকে না।

ঘুমের চেষ্টা করছি। ঘুম আসছে না। বেশ কয়েকদিন থেকে নিদ্রা এবং জাগরণের সাইকেলটা বদলাবার চেষ্টা করছি। রাত ঘুমের জন্যে এবং দিন জেগে থাকার জন্যে, এই নিয়ম ভাঙা দরকার। মানুষ ঘুমকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সূর্য নিয়ন্ত্রণ করবে না। সূর্য হচ্ছে জ্বলন্ত অগ্নিগোলক। মানুষের মত অসাধারণ মেধার প্রাণীগোষ্ঠিকে নিয়ন্ত্রণ করার তার কোন অধিকার নেই।

টানা ঘুম দিলাম। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায় সন্ধ্যায়। এই সময় মেসটা ফাঁকা ফাঁকা থাকে। বেশির ভাগই চা-নাশতা খেতে বাইরে যায়। মেসে শুধু একবেলা খাবার ব্যবস্থা, রাতে। এক কাপ চা খেতে হলেও রাস্তা পার হয়ে স্টলে যেতে হবে। ইদানীং অবশ্যি নতুন এক চাওয়ালা শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। এরা বিশাল ফ্লাস্কে করে চা ফেরি করে। চায়ের দাম ফিক্সড — এক টাকা কাপ। চিনি বা দুধের দাম বাড়লে কাপের সাইজ ছোট হয় কিন্তু চায়ের দামের হের-ফের হয় না। আমাদের এখানে যে ছেলে চা বিক্রি করে তার নাম মতি। দেখতে রাজপুত্রের মত, আসলে ভিখিরিপুত্র।

বারান্দায় এসে মতিকে খুঁজলাম। মতি এখনো আসেনি, তবে অপরিচিতি এক ভদ্রলোক এসেছেন। শুকনো মুখে টুলে বসে আছেন। ভদ্রলোক অপরিচিত হলেও দেখামাত্র চিনলাম — কারণ তাঁর চশমার একটা ডাঁট ভাঙা সুতা দিয়ে কানের সঙ্গে বাঁধা। ভদ্রলোক সন্দেহজনক দৃষ্টিতে আমাকে দেখছেন। আমি বললাম, কি ভাই, ভাল আছেন?

তিনি হকচকিয়ে গেলেন। উঠে দাঁড়ালেন।

'বদরুল সাহেবের কাছে এসেছেন, তাই তো?'

'জ্বি স্যার?'

'টাকা ধারের জন্যে?'

ভদ্রলোকে খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন। চট করে কিছু বলতে পারছেন না। আবার খুব চেষ্টা করছেন কিছু বলতে।

আমি বললাম, বদরুল সাহেব আমাকে আপনার কথা বলেছেন। খুবই প্রশংসা করছিলেন। প্রি-টেস্ট পরীক্ষায় একটা এক্সট্রা না-কি ভুল হয়েছিল। তাড়াহুড়া করেছিলেন নিশ্চয়ই। অনেক সময় ওভার কনফিডেন্সেও সমস্যা হয়। যাই হোক, কেমন আছেন বলুন।

'জ্বি ভাল। বদরুল কখন আসবে?'

'উনি আসবেন কোত্থেকে?'

'এখানে থাকেন না?'

'আগে থাকতেন। মেসে অনেক বাকি পড়ে গেছে। চারদিকে ধার-দেনা। পালিয়ে গেছেন।'

'নিচের ম্যানেজার সাহেব আমাকে বললেন, মেসেই থাকে।'

'ম্যানেজার তাই বলেছে? সে রকমই বলার কথা। সেও জানে না। জানলে জিনিসপত্র ক্রোক করে রেখে দিত। চুপি চুপি পালিয়েছে। শুধু আমি জানি। আপনাকে বললাম, কারণ আপনি তার ক্লোজ ফ্রেন্ড। ছাত্র জীবনের বন্ধু। অংকে সব সময় হাই মার্ক পেয়েছেন।'

'বদরুল থাকে কোথায়?'

'সেটাও বলা নিষেধ। যাই হোক, আপনাকে বলছি। দয়া করে খবরটা গোপন রাখবেন। উনি টেকনাফের দিকে চলে গেছেন।'

'কোন দিকে গেছে বললেন?'

'টেকনাফের দিকে। চিটাগাং হিল ট্রেক্ট। তাঁর দূর সম্পর্কের এক মামা আছেন, বন বিভাগে চাকরি করেন, তাঁর কাছে গেছেন। কিছু মনে করবেন না, আপনার নামটা যেন কি?'

'আবদুর রশীদ।'

'শুনুন আবদুর রশীদ সাহেব। উনার জন্যে অপেক্ষা করে লাভ নেই। এখানে উনার

খোঁজে আসাও অর্থহীন। চলে যান।'

'চলে যাব?'

'আপনাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারি, শুধু চা। খাবেন?'

আবদুর রশীদ হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সে পুরোপুরি আশাহত। আমি ভদ্রলোককে চা খাওয়াতে নিয়ে গেলাম। চা খাওয়ালাম, সিঙ্গাড়া খাওয়ালাম। এইখানেই শেষ করলাম না, রাস্তার পাশে ঘড়ি সারাইয়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে চশমার ডাঁট লাগিয়ে দিলাম। আমার সর্বমোট ১৩ টাকা খরচ হল।

ভদ্রলোক বললেন, ভাই সাহেব, আপনাকে একটা কথা বলি যদি কিছু মনে না করেন। আপন ভেবে বলছি।

'বলুন, কিছু মনে করব না।'

'কথাটা বলতে খুবই লজ্জা পাচ্ছি। আপনি অতি মহৎপ্রাণ এক ব্যক্তি। আপনাকে বিব্রত করতেও লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে . . . '

'মাথা কাটা যাওয়ার কিছু নেই, আপনি বলুন।'

'দারুণ এক সংকটে পড়েছি ভাই সাহেব। আত্মহত্যা ছাড়া এখন আর পথ দেখছি না।'

'ছেলে অসুস্থ। টাকার অভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না?'

'ধরেছেন ঠিকই। তবে ছেলে না, মেয়ে। কনিষ্ঠা কন্যা। সকাল থেকে হাঁপানির মত হচ্ছে। ডাক্তার ইনজেকশনের কথা বলল —'

'দাম কত ইনজেকশনের?'

'শখানেক টাকা হলে হয়। ইনজেকশন, সেই সঙ্গে কি ট্যাবলেট যেন দিয়েছে। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, চিকিৎসা করার টাকা কোথায়? তুমি বরং গলা টিপে মেরে ফেল।'

'উনি গলা টিপে মারতে রাজি হচ্ছেন না?'

আবদুর রশীদ আমার এই কথায় অস্বস্তিতে পড়ে গেল। আমি বললাম, এইসব কঠিন কাজ স্ত্রীলোক দিয়ে হবে না। এইসব হল পুরুষের কাজ। গলা টিপে মারতে হলে আপনাকেই মারতে হবে।

'ভাই সাহেব, ঠাট্টা করছেন?'

'না, ঠাট্টা করছি না। মৃত্যু কোন ঠাট্টা-তামাশার বিষয় না। আমি আপনাকে একশ' টাকা দেব।'

'দিবেন? সত্যি দিবেন?'

'অবশ্যই দেব। স্কুল-জীবনে আপনি অংকে খুব ভাল ছিলেন, তাই না? কেমন ভাল ছিলেন প্রমাণ দিন দেখি। সহজ একটা অংক জিজ্ঞেস করব। কারেক্ট উত্তর দেবেন — একশ' টাকা নিয়ে চলে যাবেন।'

আবদুর রশীদ ক্ষীণ স্বরে বলল, কি অংক?

'একটা বাড়িতে চারটা হারিকেন জ্বলছিল। গভীর রাতে কথা নেই বার্তা নেই শুরু হল ঝড়। একটা হারিকেন গেল নিভে। এখন আপনি বলুন ঐ বাড়িতে হারিকেন এখন কয়টা?'

'তিনটা!'

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, হয়নি। একটা হারিকেন নিভে গেছে ঠিকই। হারিকেনের সংখ্যা তো কমেনি। হারিকেন চারটাই আছে। আপনি তো ভাই অংক শিখতে পারেননি। টাকাটা দিতে পারলাম না। কিছু মনে করবেন না।

আবদুর রশীদ দাঁড়িয়ে আছে — আমি হাঁটা ধরেছি। মেসে ফিরে যাব। সারাদিন কিছু না খাওয়াতে খিদেয় নাড়িভূঁড়ি পাক দিচ্ছে। মেসে রান্না হয়েছে কি-না খোঁজ নিতে হবে। মেসের ভাত সকাল সকাল নেমে যায়। ভাত নেমে গেলে একটা ডিম ভেজে দিতে বলব। আগুন-গরম ভাত ডিমভাজা দিয়ে খেতে অতি উপাদেয়। তবে খেতে হয় চুলা থেকে ভাত নামার সঙ্গে সঙ্গে, দেরি করা যায় না।

ঘর থেকে বেরুবার জন্যে রাত বারোটা খুব ভাল সময়। জিরো আওয়ার। কাউন্ট আপ শুরু হয় জিরো আওয়ার থেকে — 0, 1, 2, 3 . . . ঠিক রাত বারোটায় কি বার হবে? শনিবার নয়, রবিবারও নয়। জিরো আওয়ারে বার থেমে থাকে।

দরজা তালাবন্ধ করে বেরুচ্ছি, দেখি বদরুল সাহেব। কলঘর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে ফিরছেন। মুখ ভেজা, কাঁধে গামছা। রাত বারোটায় আমার মন-টন খুব ভাল থাকে। কাজেই আমি উল্লাসের সঙ্গেই বললাম, কি খবর বদরুল সাহেব!

তিনি লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন।

'কোথায় ছিলেন আজ সারাদিন?'

তিনি আবারো হাসলেন। আমি বললাম, গিয়েছিলেন নাকি ইয়াকুব আলির কাছে?

'জ্বি।'

'দেখা হয়নি?'

'দেখা হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যস্ত।'

'কথা হয়নি?'

'হয়েছে। চাকরির ব্যাপারটা বললাম।'

'আগেও তো বলেছিলেন। আবার কেন?'

'ভুলে গিয়েছে। নানান কাজকর্ম নিয়ে থাকে তো। আজকে তার আবার একটা দুর্ঘটনা ঘটল। তার মনটা ছিল খারাপ।'

'কি দুর্ঘটনা?'

'একুশ লাখ টাকা দিয়ে নতুন গাড়ি কিনেছে। সেই গাড়ির হেডলাইট ভেঙে ফেলেছে। কেয়ারলেস ড্রাইভার। ঐ নিয়ে নানান হৈ-চৈ, ধমকাধমকি চলছে, তার মধ্যে আমি গিয়ে পড়লাম।'

'আপনি ধমক খেয়েছেন?'

'জ্বি-না, আমি ধমক খাব কেন? আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড। গাড়ির হেডলাইট ভাঙার কারণে ইয়াকুবের মন খারাপ দেখে আমারো মন খারাপ হল। এর মধ্যে চাকরির কথাটা তুলে ভুল করেছি।'

'ইয়াকুব সাহেব রেগে গেছেন?'

'তা ঠিক না। বলল বায়োডাটা তার সেক্রেটারির কাছে দিয়ে যেতে। দু'টা পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ বায়োডাটা, সে দেখবে।'

'দেখবে বলেছে?'

'দেখবে তো বটেই। স্কুল-জীবনের বন্ধু, ফেলবে কি করে? বায়োডাটা নিয়েই সারাদিন ছোটাছুটি করলাম। একদিনের মধ্যে ছবি তুলে, বায়োডাটা টাইপ করে, পাঁচটার সময় একেবারে ইয়াকুবের হাতেই ধরিয়ে দিয়েছি।'

'ইয়াকুব সাহেব আপনার কর্মতৎপরতা দেখে নিশ্চয়ই খুব খুশি হলেন।'

বদরুল চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, খুশি হননি?

'জ্বি-না। একটু মনে হয় বেজার হয়েছে; সেক্রেটারির হাতে দিতে বলেছে, আমি তা না করে তার হাতেই দিলাম — এতে সামান্য বিরক্ত। এত বড় একটা অর্গানাইজেশন চালায়। তার তো একটা সিস্টেম আছে। হুট করে হাতে কাগজ ধরিয়ে দিলে হবে না। ভুলটা আমার।'

'বদরুল সাহেব, আপনার কি ধারণা ইয়াকুব আলি আপনাকে চাকরি দেবেন?'

'অবশ্যই। আমার সামনেই সেক্রেটারিকে ডেকে বায়োডাটা দিয়ে দিল। বলল উপরে আর্জেন্ট লিখে ফাইলে রাখতে।'

'কবে নাগাদ চাকরি হবে বলে মনে করছেন?'

'খুব বেশি হলে এক সপ্তাহ। ইয়াকুব আমাকে এক সপ্তাহ পরে খোঁজ নিতে বলেছে। আগামী শনিবারের মধ্যে ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে। স্বপ্নেও তা-ই দেখলাম।'

'এর মধ্যে স্বপ্নও দেখে ফেলেছেন?'

'জ্বি। ছোটাছুটি করে কাগজপত্র জোগাড় করে টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম, একটু রেস্ট নেই। ইয়াকুবের পি. এ. বলল, বসুন, চা খান। চা খাওয়ার জন্যে বসেছি। বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনির মত এসে গেল। তখন স্বপ্নটা দেখেছি। দেখলাম কি — ইয়াকুব এসেছে। তার হাতে বিরাট এক মৃগেল মাছ। এইমাত্র ধরা হয়েছে। ছটফট করছে। ইয়াকুব বলল, নিজের পুকুরের মাছ। তোর জন্যে আনলাম। নিয়ে যা। মাছ স্বপ্নে দেখা খুবই ভাল। হিমু ভাই, আপনি যাচ্ছেন কোথায়?'

'হাঁটতে যাচ্ছি।'

'রাতদুপুরে কেউ হাঁটতে যায়? আশ্চর্য! দুপুর রাতে হাঁটার মধ্যে আছে কি?'

'চলুন, আমার সঙ্গে হেঁটে দেখুন।'

'যেতে বলছেন?'

'এক রাতে একটু অনিয়ম করলে কিছু হবে না।'

'খুবই টায়ার্ড লাগছে হিমু ভাই। ভাবছি ঘুমুব।'

'ঘুম তো আপনার আসবে না। খিদে পেটে শুয়ে ছটফট করবেন। এরচে' চলুন কোথাও নিয়ে গিয়ে আপনাকে খাইয়ে আনি। মনে হচ্ছে সারাদিন কিছু খাননি।'

'সারাদিন খাইনি কি করে বুঝলেন?'

'বোঝা যায়। মানুষের সব খবর তার চোখে লেখা থাকে। ইচ্ছে করলেই সেই লেখা পড়া যায়। কেউ ইচ্ছে করে না বলে পড়তে পারে না।'

'আপনি পারেন?'

'মাঝে মাঝে পারি। সব সময় পারি না। আপনি যে সারাদিন খাননি এটা আপনার চোখে পড়তে পারছি। এই সঙ্গে আরেকটা জিনিশ পড়া যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে, আজ দিনটা আপনার জন্যে খুব আনন্দের।'

বদরুল সাহেব হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছেন। হতভম্ব ভাব কাটার পর বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আজ আমার বিবাহ বার্ষিকী। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, সন্ধ্যার সময় হঠাৎ মনে হয়েছে — আরে আজ তো ২৫শে এপ্রিল।

'চলুন, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বিয়ের দিনের গল্প করবেন। অনেকদিন কারো বিয়ের গল্প শুনি না।'

বদরুল সাহেব লজ্জিত গলায় বললেন, বলার মত কোন গল্প না।

'সব গল্পই বলার মত।'

রাস্তায় নেমেই বদরুল সাহেব বিস্মিত স্বরে বললেন, হাঁটতে তো ভালই লাগছে। রাস্তাগুলি অন্য রকম লাগছে। আশ্চর্য তো! ব্যাপারটা কি?

আমি ব্যাপার ব্যাখ্যা করলাম না। রাতের বেলা রাস্তার চরিত্র বদলে যায় কেন সেই ব্যাখ্যা একেক জনের কাছে একেক রকম। আমার ব্যাখ্যা আমার কাছেই থাকুক।

বদরুল সাহেব বললেন, হাঁটতে হাঁটতে আমরা কোথায় যাব?

আমি বললাম, মাথায় কোন নির্দিষ্ট জায়গা থাকলে হাঁটার কোন আরাম থাকে না। হাঁটতে হবে এলোমেলোভাবে। বলুন কিভাবে আপনাদের বিয়ে হল।

'মুন্সিগঞ্জে বেড়াতে গিয়েছিলাম। খালার শ্বশুরবাড়িতে। ওদের একান্নবর্তী পরিবার। লোকজন গিজ গিজ করছে। কে কখন খায় কোন ঠিক নেই। খাওয়া-দাওয়ার ভেতরে কোন যত্ন নেই। খেলে খাও, না খেলে খেও না ওই রকম ভাব। মাঝে মাঝে কি হয় জানেন? ভাল একটা পদ হয়ত রান্না হচ্ছে, এদিকে বেশির ভাগ মানুষ খেয়ে উঠে গেছে। কেউ জানেই না — মূল পদ এখনো রান্না হয় নি . . .

বদরুল সাহেব তাঁর বিয়ের গল্পের জায়গায় খাওয়ার গল্প ফেঁদে বসেছেন। এই খাওয়া-দাওয়ার ভেতর থেকে বিয়ের গল্প হয়ত শুরু হবে, কখন হবে কে জানে। ভদ্রলোকের সম্ভবত খিদেও পেয়েছে। খিদের সময় শুধু খাবার কথাই মনে পড়ে। তাঁকে

খাওয়ানোর কি ব্যবস্থা করা যায় বুঝতে পারছি না। আবারো পকেটবিহীন পাঞ্জাবি নিয়ে বের হয়েছি। এই পাঞ্জাবি মনে হয় আর ব্যবহার করা যাবে না। বদরুল সাহেব গল্প চালিয়ে যাচ্ছেন — সেদিন কি হয়েছে শুনুন। পাবদা মাছ এসেছে। এক খলুই মাছ, প্রত্যেকটা দেড় বিঘৎ সাইজ। এ বাড়িতে আবার অল্প কিছু আসে না। যা আসে ঝুড়ি ভর্তি আসে . . .

আমরা মূল রাস্তা ছেড়ে গলিতে ঢুকলাম। বদরুল সাহেবের গল্পে বাধা পড়ল। আমরা টহল পুলিশের মুখোমুখি পড়ে গেলাম। খাকি পোশাকের কারণে সব পুলিশ একরকম মনে হলেও এটি যে গতকালেরই দল এতে আমার কোন সন্দেহ রইল না। আমি আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, কি খবর?

টহল পুলিশের দল থমকে দাঁড়াল।

'আজ আপনাদের পাহারা কেমন চলছে?'

এই প্রশ্নেরও জবাব নেই। বদরুল সাহেব হকচকিয়ে গেছেন। কথাবার্তার ধরন ঠিক বুঝতে পারছেন না।

কালকের ওস্তাদজি আজও প্রথম কথা বললেন, তবে তুই-তোকারি না, ভদ্র ভাষা।

'আপনারা কোথায় যান?'

'ভাত খেতে যাই। আজ অবশ্যি আমি খাব না। এই ভদ্রলোক খাবেন। উনার নাম বদরুল আলম। উনাকে থাপ্পড় দিতে চাইলে দিতে পারেন। উনিও কিছু বলবেন না। উনিও আমার মতই বিশিষ্ট ভদ্রলোক।'

বদরুল সাহেব ফিসফিস করে বললেন, ব্যাপারটা কি কিছুই তো বুঝতে পারছি না। কি সমস্যা?

'কোন সমস্যা না। জনগণের সেবক পুলিশ ভাইরা এখন আপনার রাতের খাবার ব্যবস্থা করবেন।'

পুলিশ দলের একজন বলল, কালকের ব্যাপারটা মনে রাখবেন না। নানা কিসিমের বদলোক রাস্তায় ঘুরে, নেশা করে। আমরা বুঝতে পারি নাই। একটা মিসটেক হয়েছে।

'আমি কিছু মনে করিনি। মনের ভেতর অতি সামান্য খচখচানি আছে, সেটা দূর হয়ে যাবে — যদি আপনারা বদরুল সাহেবের রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।'

'এত রাতে?'

'আপনাদের কারবারই তো রাতে। আপনাদের একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দি — কোন একটা বাড়িতে গিয়ে কলিংবেল টিপুন। বাড়িওয়ালা দরজা খুলে এতগুলি পুলিশ দেখে যাবে ভড়কে। তখন আপনাদের যে ওস্তাদ তিনি বিনীত ভঙ্গিতে বলবেন, স্যার, এত রাতে ডিসটার্ব করার জন্যে খুবই দুঃখিত। একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক সারাদিন না খেয়ে আছেন। যদি একটু খাওয়ার ব্যবস্থা করেন! দেখবেন তৎক্ষণাৎ খাবার ব্যবস্থা হবে। মধ্যরাতের পুলিশ ভয়াবহ জিনিশ।'

বদরুল সাহেবের হতভম্ব ভাব কাটছে না। তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণাও সম্ভবত মাথায় উঠে গেছে। পুলিশ দলের একজন আমার কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, স্যার, আপনার সঙ্গে একটু 'প্রাইভেট টক' আছে।

আমি 'প্রাইভেট টক' শোনার জন্যে ফুটপাত ছেড়ে নিচে নামলাম। সে কানের কাছে গুন গুন করে বলল, স্যার, বিরাট মিসটেক হয়েছে। রাস্তায় কত লোক হাঁটে, কে সাধু, কে শয়তান বুঝব কি ভাবে!

আমিও তার মতই নিচু গলায় বললাম, না বোঝারই কথা।

'ওস্তাদজী একটা ভুল করেছে। চড় দিয়ে ফেলেছে। তারপর থেকে উনার হাত ফুলে প্রচণ্ড ব্যথা। ব্যথার চোটে রাতে ঘুমাতে পারেননি।'

'বেকায়দায় চড় দিয়েছে। রগে টান পড়েছে। কিংবা হাতের মাসলে কিছু হয়েছে।'

'কি যে ব্যাপার সেটা স্যার আমরা বুঝে গেছি। এখন স্যার আমাদের ক্ষমা দিতে হবে। এটা স্যার আমাদের একটা আবদার।'

'আচ্ছা যান, ক্ষমা দিলাম।'

'ওস্তাদজী আজ ছুটি নিয়েছে। সারাদিন শুয়েছিল, রাতে বের হয়েছে শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য।'

'ভালই হয়েছে দেখা হয়ে গেল।'

'আপনি স্যার আমাদের জন্যে একটু দোয়া রাখবেন।'

'অবশ্যই রাখব।'

'উনার খাবার ব্যাপারে স্যার কোন চিন্তা করবেন না।'

আমি বদরুল সাহেবকে বললাম, আপনি এদের সঙ্গে যান। খাওয়া-দাওয়া করুন। তারপর মেসে চলে যাবেন। আমি ভোরবেলা ফিরব।

তিনি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছেন। কিছুতেই যাবেন না। পুলিশরা বলতে গেলে তাকে গ্রেফতার করেই নিয়ে গেল। বেচারার হতাশ দৃষ্টি দেখে মায়া লাগছে। মায়া ভাল জিনিশ না। অনিত্য এই সংসারে মায়া বিসর্জন দেয়া শিখতে হয়। আমি শেখার চেষ্টা করছি।



বাদুর-স্বভাব আয়ত্ত করার চেষ্টা সফল হচ্ছে না। বাদুর-ভাব কয়েকদিন থাকে তারপর ভেতর থেকে মানুষ-ভাব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রাতে ঘুমুতে ইচ্ছে করে। দিনে হাজার চেষ্টা করেও ঘুমুতে পারি না। এখন আমার মানুষ ফেজ চলছে। রাতে ঘুমুচ্ছি, দিনে জেগে আছি। রাস্তায় যাচ্ছি। হাঁটাহাঁটি করছি। দিনে হাঁটাহাঁটি করার মধ্যেও কিছু থ্রিল আছে। হঠাৎ হঠাৎ খুব বিপদজনক কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। যার সঙ্গে নিশি রাতে দেখা হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। রাত তিনটার সময় নিশ্চয়ই রেশমা খালার সঙ্গে নিউমার্কেটের কাছে দেখা হবে না। প্রায় দু'বছর পর রেশমা খালার সঙ্গে দেখা। পাজেরো নামের অভদ্র গাড়ির ভেতর ড্রাইভারের সিটের পাশে তিনি বসে আছেন। তাঁর মত মহিলা ড্রাইভারের পাশে বসবেন ভাবাই যায় না। তবে শুনেছি পাজেরো গাড়িগুলি এমন যে ড্রাইভারের সীটের পাশে বসা যায়। এতে সম্মান হানি হয় না।

রেশমা খালা হাত উঁচিয়ে ডাকলেন, এই হিমু, এই . . .। ড্রাইভার ক্রমাগত হর্ন দিতে লাগল। আমার উচিত দ্রুত পালিয়ে যাওয়া। কোন গলিটলির ভেতর ঢুকে পড়া। গলি না থাকলে ম্যানহোলের ঢাকনি খুলে তার ভেতর সেঁধিয়ে যাওয়া। কিছু কিছু ট্রাকের পেছনে লেখা থাকে ১০০ হাত দূরে থাকুন। রেশমা খালা সেই ট্রাকের চেয়েও ভয়াবহ। আশে পাশে গলি বা ম্যানহোল নেই। কাজেই আমি হাসিমুখে এগিয়ে গেলাম। রাস্তা পার হবার আগেই খালা চেঁচিয়ে বললেন, হিমু, তুই নাকি গলার কাঁটা নামাতে পারিস?

রেশমা খালা আমার কেমন খালা জানি না। লতায়-পাতায় খালা। ভদ্রমহিলার বয়স পঞ্চাশ পার হলেও এই মুহূর্তে খুকি সেজে আছেন। মাথা ভর্তি ঢেউ-খেলানো ঘন কাল চুল। এই চুল হংকং থেকে আনানো। ঠোঁট লাল টুক টুক করছে। জামদানী শাড়ি পরেছেন। গলায় মাটির মালা। কানে মাটির দুল। এটাই লেটেস্ট ফ্যাশান। শান্তিনিকেতন থেকে আমদানী হয়েছে।

আমি গাড়ির কাছে চলে এলাম। রেশমা খালা চোখ বড় বড় করে বললেন — বাদলের মা'র কাছে ঘটনা শুনলাম। বড় বড় সার্জন কাত হয়ে গেছে — তুই গিয়েই মন্ত্র-টন্ত্র পড়ে কাঁটা নামিয়ে ফেললি। কি রে, সত্যি?

'হ্যাঁ সত্যি। তোমার কাঁটা লাগলে খবর দিও, নামিয়ে দিয়ে যাব।'

'তোকে খবর দেব কি ভাবে? তোর ঠিকানা কি? তোর কোন কার্ড আছে?'

'ঠিকানাই নাই — আবার কার্ড!'

'তুই এক কাজ কর না। আমার বাড়িতে চলে আয়। একতলাটা তো খালিই পড়ে থাকে। একটা ঘরে থাকবি। আমার সঙ্গে খাবি। ফ্রী থাকা-খাওয়া'

'দেখি, চলে আসতে পারি।'

'আসতে পারি-টারি না। চলে আয়। তুই কাঁটা নামানো ছাড়া আর কি পারিস?'

'আপাতত আর কিছু পারি না।'

'কে যেন সেদিন বলল, তুই ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলতে পারিস। তোর সিক্সথ সেন্স নাকি খুব ডেভেলপড।'

আমি হাসলাম। আমার সেই বিশেষ ধরনের হাসি। হাসি দেখে রেশমা খালা আরো অভিভূত হলেন।

'এই হিমু, গাড়িতে উঠে আয়।'

'যাচ্ছেন কোথায়?'

'কোথাও যাচ্ছি না। খালি বাড়িতে থাকতে কতক্ষণ আর ভাল লাগে! এই জন্যেই গাড়ি নিয়ে মাঝে মাঝে বের হই।'

'বাড়ি খালি না-কি?'

'ও আল্লা, তুই কি কিছুই জানিস না? তোর খালুর ইন্তেকালের পর বাড়ি খালি না? এত বড় বাড়িতে একা থাকি, অবস্থাটা চিন্তা করতে পারিস।'

'দারোয়ান, মালী, ড্রাইভার এরা তো আছে।'

'খালি বাড়ি কি দারোয়ান, মালী, ড্রাইভার এইসবে ভরে? তুই চলে আয়। তোর কাঁটা নামানোর ক্ষমতার কথা শুনে দারুণ ইন্টারেস্টিং লাগছে। দাঁড়িয়ে আছিস কেন? গাড়িতে উঠ।'

'আজ তো খালা যেতে পারব না। জরুরি কাজ।'

'তোর আবার কিসের জরুরি কাজ? হাঁটা ছাড়া তোর আবার কাজ কি?'

'আরেকজনের কাঁটা নামাতে হবে। চিতলমাছের কাঁটা গলায় বিঁধিয়ে বসে আছে। কোঁ কোঁ করছে। সেই কাঁটা তুলতে হবে।'

'আমাকে নিয়ে চল। আমি দেখি ব্যাপারটা কি?'

'আপনাকে নেয়া যাবে না খালা। মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যাপার তো। মেয়েদের সামনে মন্ত্র কাজ করে না।'

'মেয়েরা কি দোষ করেছে?'

'মেয়েরা কোনই দোষ করেনি। দোষ করেছে মন্ত্রে। এই মন্ত্র নারী বিদ্বেষী।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। আমাকে না নিতে চাইলে না নিবি। গাড়িতে উঠ, তোকে কিছুদূর এগিয়ে দি। রোদের মধ্যে হাঁটছিস দেখে মায়া লাগছে।'

কেউ গাড়িতে উঠার জন্যে বেশি রকম পিড়াপিড়ি করলে ধরে নিতে হবে গাড়ি

নতুন কেনা হয়েছে। আমি গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, গাড়ি নতুন কিনলে?

'নতুন কোথায়, ছয় মাস হয়ে গেলো না।'

'ছয় মাসে স্বামী পুরাতন হয় — গাড়ি হয় না। দারুণ গাড়ি।'

'তোর পছন্দ হয়েছে?'

'পছন্দ মানে! এরোপ্লেনের মত গাড়ি।'

'এই গাড়ির সবচে বড় সুবিধা কি জানিস? সামনা-সামনি কলিশন হলে গাড়ির কিছু হবে না, কিন্তু অন্য গাড়ি ভর্তা হয়ে যাবে।'

'বাহ্, দারুণ তো।'

'তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল লাগছে রে হিমু। চাকরি-বাকরি কিছু করছিস?'

'আপনার হাতে চাকরি আছে?'

'না। তোর খালুর মৃত্যুর পর মিল-টিল সব বিক্রি করে ক্যাশ টাকা করে ফেলেছি। ব্যাঙ্কে জমা করেছি। আমি একা মানুষ — মিল-টিল চালানো তো সম্ভব না। সবাই লুটে-পুটে খাবে। দরকার কি?'

'কোন দরকার নেই।'

গাড়ি চলছে। কোন বিশেষ দিকে যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে ড্রাইভার তার ইচ্ছামত চালাচ্ছে। মীরপুর রোড ধরে চলতে চলতে ফট করে ধানমণ্ডি চার নাম্বারে ঢুকে পড়ল। আবার কিছুক্ষণ পর মীরপুর রোডে চলে এল।

'হিমু!'

'জ্বি খালা।'

'তোর খালুর স্মৃতি রক্ষার্থে একটা কিছু করতে চাই। কর্মযোগী পুরুষ ছিল। পথের ফকির থেকে কলকারখানা, গার্মেন্টস, করেনি এমন জিনিস নেই। স্ত্রী হিসেবে তার স্মৃতি রক্ষার জন্যে আমার তো কিছু করা দরকার।'

'করলে ভাল। না করলেও চলে।'

'না না, করা দরকার। ভাল কিছু করা দরকার। উনার নামে একটা আর্ট মিউজিয়াম করলে কেমন হয়।'

'ভাল হয়। তবে খালু সাহেবের নামে করা যাবে না। মানাবে না।'

'মানাবে না কেন?'

"গনি মিয়া মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট" শুনতে ভাল লাগছে না। খালু সাহেবের নামটা গনি মিয়া না হয়ে আরেকটু সফেসটিকেটেড হলে মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট দেয়া যেত। তোমার নিজের নামে দাও না কেন? "রেশমা মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট" শুনতে তো খারাপ লাগছে না।'

গাড়ি মীরপুর রোড থেকে আবার ধানমণ্ডি ২৭ নম্বরে ঢুকে পড়েছে। আবারো মনে হয় মীরপুরে আসবে। ভাল যন্ত্রণায় পড়া গেল!

'খালা, আমার তো এখন যাওয়া দরকার। চিতল মাছের কাঁটা নামানো খুব সহজ

না।'

'আহা বোস না। তোর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে। কথা বলার মানুষ পাই না। কেউ আমার বাড়িতে আসে না। এটা একটা আশ্চর্য কাণ্ড। তোর খালুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কার্ড ছাপিয়ে পাঁচশ লোককে দাওয়াত দিয়েছি। তিনটা দৈনিক পত্রিকায় কোয়ার্টার পেইজ বিজ্ঞাপন দিলাম। লোক কত হয়েছে বল তো?'

'একশ?'

'আরে না — আঠারো জন। এর মধ্যে আমার নিজের লোকই সাতজন। ড্রাইভার, মালী, দারোয়ান, কাজের দু'টা মেয়ে।'

'আমাকে খবর দিলে চলে আসতাম।'

'তোকে খবর দেব কি ভাবে? তোর কি কোন স্থায়ী ঠিকানা আছে? ঠিকানা নেই। রাস্তায় যে ফকিরগুলি আছে তাদেরও ঠিকানা আছে। রাতে তারা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ঘুমায়। আজীজ মার্কেটের বারান্দায় যে ঘুমুবে সে সেখানেই ঘুমুবে। সে কমলাপুর রেল স্টেশনে ঘুমুবে না। আর তুই তো আজ এই মেসে, কাল ঐ মেসে। হিমু, তুই চলে আয় তো আমার কাছে। গুলশানের বাড়ি নতুন করে রিনোভেট করেছি। টাকাপয়সা করচ করে হুলুস্থুল করেছি। তোর ভাল লাগবে। আসবি?'

'ভেবে দেখি।'

'ভাবতে হবে না। তুই চলে আয়। থাকা-খাওয়ার খরচার হাত থেকে তো বেঁচে গেলি। মাসে মাসে না হয় কিছু হাতখরচও নিবি।'

'কত দেবে হাতখরচ?'

'বিড়ি-সিগেরেটের খরচ — আর কি! কি, থাকবি? তুই থাকলে একটা ভরসা হয়। দিনকালের যে অবস্থা চাকর-দারোয়ান এরাই বটি দিয়ে কুপিয়ে কোনদিন না মেরে ফেলে। এমন ভয়ে ভয়ে থাকি! চলে আয় হিমু। আজই চলে আয়। বাড়ি তো চিনিসই। চিনিস না?'

'হুঁ।'

'তোকে দেখে আরেকটা কথা ভাবছি — বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা আছে প্যারা নরমাল পাওয়ার যাদের, এদের বাড়িতে এনে রাখলে কেমন হয়? এস্ট্রলজার, পামিস্ট, বুঝতে পারছিস কি বলছি?'

'পারছি — ইন্সটিটিউট অব সাইকিক রিসার্চ টাইপ।'

'ঠিক বলেছিস। বাংলাদেশে তো এরকম আগে হয় নি। না-কি হয়েছে?'

'না হয়নি। করতে পার। নাম কি দেবে? "গনি মিয়া ইন্সটিটিউট অব সাইকিক রিসার্চ"?'

'নামটা কেমন শুনাচ্ছে?'

'মিয়াটা বাদ দিলে খারাপ লাগবে না — গনি ইন্সটিটিউট অব সাইকিক রিসার্চ। খালা, এইখানে আমি নামব। ড্রাইভার, গাড়ি থামাও। গাড়ি না থামালে আমি জানালা

দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়ব।'

ড্রাইভার গাড়ি থামালো। রেশমা খালা বলল, কি ঠিক হল? তুই আসছিস?

'হুঁ। আমার এ মাসের হাতখরচের টাকা দিয়ে দাও।'

'থাকাই শুরু করলি না — হাতখরচ কি?'

'আমি তো খালা চাকরি করছি না যে মাসের শেষে বেতন। এটা হল হাত খরচ।'

'তুই আগে বিছানা-বালিশ নিয়ে উঠে আয়, তারপর দেখা যাবে।'

'আচ্ছা।'

আমি লম্বা লম্বা পা ফেলা শুরু করলাম। উদ্ধার পাওয়া গেছে ,এখন চেষ্টা করা উচিত যত দূরে সরে পড়া যায়। সম্ভাবনা খুব বেশি যে খালা তার গাড়ি নিয়ে আমার পেছনে পেছনে আসবে। আমার উচিত ছোট কোন গলিতে ঢুকে পড়া, যেখানে পাজেরো টাইপ গাড়ি ঢুকতে পারে না।

'এই হিমু, এই, এক সেকেন্ড শুনে যা। এই, এই।'

বধির হয়ে যাবার ভান করে আমি গলি খুঁজছি। গাড়ির ড্রাইভার ক্রমাগত হর্ন দিচ্ছে। না ফিরলে চারদিকে লোক জমে যাবে। বাধ্য হয়ে ফিরলাম।

'নে, হাতখরচ নে। না দিলে আবার হাত খরচ দেয়া হয় নি এই অজুহাতে আসবি না।'

রেশমা খালা একটা চকচকে পাঁচশ টাকার নোট জানালা দিয়ে বাড়িয়ে ধরল।

'তুই সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় চলে আসিস। সন্ধ্যার পর থেকে আমি বাসায় থাকি। নানান সমস্যা আছে, বুঝলি? ভয়ংকর ব্যাপার ঘটেছে। কাউকে বলা দরকার। রাতে এক ফোঁটা ঘুমুতে পারি না।'

'চলে আসব।'

'টাকাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? পকেটে রাখ। হারিয়ে ফেলবি তো।'

'খালা, আমার পকেট নেই। যাবতীয় টাকাপয়সা আমাকে হাতে নিয়ে ঘুরতে হয়।'

'বলিস কি!'

'খালা, যাই?'

যাই বলে দেরী করলাম না, প্রায় দৌড়ে এক গলিতে ঢুকে পড়লাম।

টাকা কি কেউ হাতে নিয়ে ঘুরে? বাসের কন্ডাক্টাররা টাকা হাতে রাখে। আর কেউ? পাঁচশ টাকার চকচকে একটা নোট হাতে রাখতে বেশ ভালই লাগছে। নোটটা এতই নতুন যে ভাজ করতে ইচ্ছা করছে না। চনমনে রোদ ওঠায় গরম লাগছে। নোটের সাইজ আরেকটু বড় হলে টাকা দিয়ে বাতাস খেতে খেতে যাওয়া যেত।

খালার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি শ্যামলীতে। সেখান থেকে কোথায় যাব বুঝতে পারছি না। হেঁটে হেঁটে আবার নিউ মার্কেটের কাছে চলে আসা যায়। ইচ্ছা করলে রিকশা নিতে পারি, ভাড়া দেয়া সমস্যা হবে না। বুড়ো অথর্ব টাইপ রিকশাওয়ালা

যাদের রিকশায় কেউ চড়ে না, এমন কেউ যে রিকশা ঠিকমত টানতেও পারে না, বয়সের ভারে কানেও ঠিক শুনে না, গাড়ির সামনে হঠাৎ রিকশা নিয়ে উপস্থিত হয় — এইসব রিকশায় চড়া মনে পদে পদে বিপদের মধ্যে পড়া।

যেহেতু রেশমা খালার বাড়িতে আমি থাকতে যাব না, সেহেতু এই পাঁচশ টাকা কোন এক সৎকর্মে ব্যয় করতে হবে।

অনেকদিন কোন সৎকর্ম করা হয় না। ভাড়া হিসেবে পুরো নোটটা দিয়ে দিলে সাধারণ মানের একটা সৎকর্ম করা হবে।

পছন্দসই কোন রিকশাওয়ালা পাওয়া যাচ্ছে না। একজনেক বেশ পছন্দ হল, তবে তার বয়স অল্প। বুড়ো রিকশাওয়ালা কেউই নেই। বুড়োরা আজ কেউই রিকশা বের করেনি। আসাদ গেটে এসে একজনকে পাওয়া গেল। চলনসই ধরনের বুড়ো। রিকশার সীটে বসে চায়ে পাউরুটি ভিজিয়ে খাচ্ছে। সকালের ব্রেকফাস্ট বোধ হয় না, বারোটার মত বাজে। লাঞ্চ হবারও সম্ভাবনা কম। সম্ভবত প্রি-লাঞ্চ।

'রিকশা, ভাড়া যাবেন?'

বুড়ো প্রায় ধমকে উঠলো — না। খাওয়ার মাঝখানে বিরক্ত করায় সে সম্ভবত ক্ষেপে গেছে।

'কাছেই যাব। বেশি দূর না — নিউ মার্কেট।'

'ঐ দিকে যামু না।'

'ফার্ম গেট যাবেন? ফার্মগেট গেলেও আমার চলে।'

'যামু না।'

'যাবেন না কেন?'

'ইচ্ছা করতাছে না।'

'আমি না হয় অপেক্ষা করি। আপনি চা শেষ করেন, তারপর যাব। ফার্মগেট যেতে না চান তাও সই। অন্য যেখানে যেতে চান যাবেন। আমাকে কোন এক জায়গায় নামিয়ে দিলেই হবে।'

মনে হল আমার প্রস্তাবে সে রাজি হয়েছে। কিছু না বলে চা-পাউরুটি শেষ করল। লুঙ্গির ভাজ থেকে বিড়ি বের করে আয়েশ করে বিড়ি টানতে লাগল। আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছি। কাউকে দান করতে যাওয়াও সমস্যা। দান করতেও ধৈর্য লাগে। হুট করে দান করা যায় না। বুড়ো বিড়ি টানা শেষ করে রিকশার সীট থেকে নামল। আমি উঠতে যাচ্ছি সে গম্ভীর গলায় বলল, কইছি না, যামু না। ত্যক্ত করেন ক্যান?'

সে খালি রিকশা টেনে বেরিয়ে গেল। একটু সামনে গিয়ে দু'জন যাত্রীও নিল। যে কোন কারণেই হোক আমাকে তার পছন্দ হয় নি। পাঁচশ টাকার চকচকে নোটটা তাকে দেয় গেলো না।

আমি ফার্মগেটের দিকে রওনা হলাম। নানান কিসিমের অভাবী মানুষ ঐ জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। ভিক্ষার বিচিত্র টেকনিক দেখতে হলে ফার্মগেটের চেয়ে ভাল কোন

জায়গা হতে পারে না। একবার একজনকে পেয়েছিলাম ইংরেজিতে ভিক্ষা করেন।

'Sir, I am a needy man, sir.'
'Three school going daughters.'
'Lost my job, presently pennyless.'

আমি বললাম, ইংরেজিতে ভিক্ষা করছেন কেন? বাংলা ভাষার জন্যে আমরা এত রক্ত দিয়েছি সে কি ইংরেজিতে ভিক্ষা করার জন্যে? ভিক্ষার জন্যে বাংলার চেয়ে ভাল ভাষা হতেই পারে না।

ইংরেজি ভাষার ভিক্ষুক চোখ মুখ কুঁচকে তাকাল। আমি বললাম, ফেব্রুয়ারি মাসেও কি ইংরেজিতে ভিক্ষা করেন? না-কি তখন বাংলা ভাষা?

আরেকজন আছেন, ভদ্র চেহারা। ভদ্র পোশাক। তিনি এসে খুবই আদবের সঙ্গে বলেন, ভাই কিছু মনে করবেন না — কয়টা বাজে ! আমার ঘড়িটা বন্ধ।

যাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি ভদ্রলোকের ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়ে যান — ঘড়ি দেখে সময় বলেন।

অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকাল মানুষ এমন হয়েছে সময় জিজ্ঞেস করলে রেগে যায়।

'না না, ঠিক আছে।'

তখন ভদ্রলোক গলা নিচু করে বলেন — ভাই সাহেব, একটা মিনিট সময় হবে? দু'টা কথা বলতাম।

যে সময় দিয়েছে সেই মরেছে। তার বিশ পঁচিশ টাকা খসবেই।

আরেক ভদ্রলোককে মাঝে মাঝে দেখা যায়। খদ্দরের পায়জামা পাঞ্জাবি পরা। মুখে দাড়িগোফের জঙ্গল, হাতে বেনসনের প্যাকেট। ভদ্রলোকের পাঞ্জাবির পকেটে সম্রাট আকবরের সময়কার একটা মোহর। দেড় ভরির মত ওজন। তাঁর গল্প হচ্ছে — তিনি এরকম মুদ্রা ভর্তি একটা ঘটি পেয়েছেন। কাউকে জানাতে চাচ্ছেন না। জানলে সরকার সীজ করে নিয়ে যাবে। তিনি গোপনে মুদ্রাগুলি বিক্রি করতে চান। তাই বলে সস্তায় না। সোনার যা দাম সেই হিসেবে কিনতে হবে। কারণ খাঁটি সোনার মোহর। ভদ্রলোকের মূল ব্যবসার জায়গা ফার্মগেট না। ফার্মগেটে তিনি অন্য উদ্দেশ্যে আসেন। উদ্দেশ্যটা আমার কাছে পরিষ্কার না।

পরিচিত ভিক্ষুকের কাউকেই পেলাম না তবে আশ্চর্যজনকভাবে আবদুর রশীদকে পেয়ে গেলাম। চশমা দেখে চিনলাম। চশমার ডাঁট নেই, সূতা দিয়ে কানের সঙ্গে বাঁধা। হাতে এক তাড়া কাগজ নিয়ে এর-তার কাছে যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান। হলুদ রঙের বড় একটা খামও আছে। নির্ঘাৎ এক্সরে প্লেট।

'রশীদ সাহেব না? কেমন আছেন? চিনতে পারছেন?'

ভদ্রলোক চশমার আড়াল থেকে পিট পিট করে তাকাচ্ছেন। চিনতে পারছেন কি-না বোঝা যাচ্ছে না।

'চশমার ডাঁট আবার ফেলে দিয়ে সূতা লাগিয়েছেন? এতে কি ভিক্ষার সুবিধা হয়?'

'আপনাকে চিনতে পারছি না।'

'চিনবেন না কেন? আমি বদরুল সাহেবের বন্ধু। আপনার হাতে কি? প্রেসক্রিপশান? এতো পুরানো টেকনিকে গেলেন কেন?'

আবদুর রশীদ কাঁপা কঁপা গলায় বললেন, ছেলে মরণাপন্ন। লাংসে পানি জমেছে। পুরিসি। প্রফেসর রহমান ট্রিটমেন্ট করছেন। বিশ্বাস না হলে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১২ নং ওয়ার্ডে যেতে পারেন।

'অবস্থা খারাপ?'

আবদুর রশীদ জবাব দিলেন না। ক্রুর দৃষ্টিতে আমাকে দেখছেন। আমি বললাম, টাকাপয়সা কিছু জোগাড় করতে পেরেছেন?

'তা দিয়ে আপনার দরকার কি?'

'দরকার আছে। আমি এককাপ চা খাব। চা এবং একটা সিগারেট। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। হাতে একদম পয়সা নেই।'

'পাঁচশ টাকার একটা নোট তো আছে।'

'নোটটা আমার না। বুড়ো এক রিকশাওয়ালার নোট। তাকে ফিরত দিতে হবে। খাওয়াবেন এক কাপ চা? আপনার কাছে আমার চা পাওনা আছে। ঐদিন আপনাকে চা-সিঙ্গাড়া খাইয়ে ছিলাম।'

আবদুর রশীদ চা খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। শুকনো গলায় বললেন, চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবেন?

'সিঙ্গাড়া খাওয়ান। তাহলে শোধবোধ হয়ে যাবে। আপনিও আমার কাছে ঋণী থাকবেন না। আমিও ঋণী থাকবো না।'

চায়ের সঙ্গে সিঙ্গাড়াও এল। আমি গলার স্বর নামিয়ে বললাম, রশীদ সাহেব, ভিক্ষার একটা ভাল টেকনিক আপনাকে শিখিয়ে দেই। কিছুদিন ব্যবহার করতে পারবেন, তবে এক জায়গায় একবারের বেশি দু'বার করা যাবে না। জায়গা বদল করতে হবে। বলব?

রশীদ সাহেব চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। তাঁর চোখ-মুখ কঠিন। আমি খানিকটা ঝুঁকে এসে বললাম, ময়লা একটা গামছা শুধু পরবেন। সারা শরীরে আর কিছু থাকবে না। চোখে চশমা থাকতে পারে। আপনি করবেন কি — মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত টাইপের লোকদের কাছে যাবেন। গিয়ে নিচু গলায় বলবেন — আমার কোন সাহায্য লাগবে না, কিচ্ছু লাগবে না, দোকান থেকে আমাকে শুধু একটা লুঙ্গি কিনে দেন। কেউ টাকা দিতে চাইলেও নিবেন না। দেখবেন দশ মিনিটের ভেতর আপনাকে লুঙ্গি কিনে দেবে। তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন — বড় লোকের কাছে কিছু চাইবেন না। আপনি গামছা পরে আছেন, না নেংটো আছেন তাতে ওদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু যারা নিম্নবিত্ত তারা আপনাকে দেখে আতংকগ্রস্ত হবে। ওদের মনে হবে একদিন আপনার মত অবস্থা তাদেরও হতে পারে। তখন তারা ব্যস্ত হয়ে পড়বে লুঙ্গি কিনে দিতে। সেই লুঙ্গি আপনি

বিক্রি করে দেবেন। আবার আরেকটার ব্যবস্থা করবেন। বুঝতে পারছেন? মন দিয়ে কাজ করলে দৈনিক পাঁচ থেকে ছ'টা লুঙ্গির ব্যবস্থা ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে।

আবদুর রশীদ কঠিন চোখে তাকালেন। আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, ভাল বুদ্ধি দিয়েছি, এখন একটা সিগারেট খাওয়ান।

আবদুর রশীদ সিগারেট খাওয়ালেন না। চা-সিঙ্গাড়ার দাম দিয়ে উঠে চলে গেলেন।

বুড়ো রিকশাওয়ালা একজন পাওয়া গেল। বুড়ো হলেও তার গায়ে শক্তি সামর্থ ভালই। টেনে রিকশা নিয়ে যাচ্ছে। গল্প জমাবার চেষ্টা করলাম। গল্প জমল না। শুধু জানালো তার আদি বাড়ি ফরিদপুর।

সাতটাকা ভাড়ার জায়গায় পাঁচশ টাকা ভাড়া পেয়ে তার চেহারার কোন পরিবর্তন হল না। নির্বিকার ভঙ্গিতেই সে টাকাটা রেখে দিল। গামছা দিয়ে মুখ মুছল। মনে হয় তার বিস্মিত হবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে।

ম্যানেজার হায়দার আলি খাঁ আমাকে দেখে আনন্দিত গলায় বললেন, সকাল থেকে আপনার জন্যে একটা মেয়ে বসে আছে। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, শেষে আমি আপনার ঘর খুলে দিলাম।

'ঘর খুলে দিলেন কেন?'

'মেয়েছেলে কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'নাম কি মেয়ের?'

'নাম জিজ্ঞেস করি নাই। নাম জিজ্ঞেস করলে বেয়াদবী হয়। সুন্দর মত মেয়ে।'

রূপা না-কি? রূপা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। সে এসে দীর্ঘ সময় বসে থাকবে না। গাড়ি থেকেই তার নামার কথা না। সে গাড়িতে বসে থাকবে — ড্রাইভারকে পাঠাবে খোঁজ নিতে। তাহলে কে হতে পারে?

ঘরে ঢুকে দেখি বাদলদের বাসায় যে মেয়েটিকে দেখেছিলাম — সে। পদার্থবিদ্যার ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী। মীরা কিংবা ইরা নাম।

আমি খুব সহজ ভাবে ঘরে ঢুকে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য না হওয়ার ভঙ্গি করে বললাম, কি খবর ইরা, ভাল?

ইরা বসেছিল, উঠে দাঁড়াল। কিছু বলল না। তার মুখ কঠিন। ভুরু কুঁচকে আছে। বড় ধরনের ঝগড়া শুরুর আগে মেয়েদের চেহারা এ রকম হয়ে যায়।

'আমার এখানে কি মনে করে? গলায় কাঁটা?'

'আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। আমি সেই সকাল এগারোটা থেকে বসে আছি।'

'বোস। তারপর বল কি কথা।'

'আপনার সঙ্গে আমার কথা ছিল যে আপনি আমাকে আপনি আপনি করে বলবেন।'

'আমার একদম মনে থাকে না। কোন কোন মানুষকে প্রথম দেখা থেকেই এত আপন মনে হয় যে শুধু তুমি বলতে ইচ্ছে করে।'

'দয়া করে মেয়েভুলানো কথা আমাকে বলবেন না। এই জাতীয় কথা আমি আগেও শুনেছি।'

'পাত্তা দেননি?'

'পাত্তা দেয়ার কোন কারণ আছে কি?'

'আছে। ছেলেরা নিতান্ত অপারগ হয়ে এইসব কথা বলে। প্রথম দেখাতে তো সে বলতে পারে না — "আমি আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি।" বলতে লজ্জা লাগে। যে শোনে তারো খারাপ লাগে। কাজেই ঘুরিয়ে কথা বলার চেষ্টা করা হয়।'

'প্রেম বিষয়ক তত্ত্বকথা আমি শুনতে আসিনি। আপনার সঙ্গে আমার কিছু জরুরী কথা আছে। আমি কথাগুলি বলে চলে যাব।'

'অবশ্যই। একটু বসুন। ঠাণ্ডা হোন। ঠাণ্ডা হয়ে তারপর বলুন।'

ইরা বসল না। দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ-মুখ যতটা কঠিন ছিল তারচেয়েও কঠিন হয়ে গেলো।

'কথাটা হচ্ছে বাদলদের বাড়িতে যে কাজের বুয়া আছে — তার একটা মেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল।'

'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। লুৎফা নাম।'

'সে না-কি আপনাকে বলেছিল তার মেয়েকে খুঁজে দিতে।'

'হ্যাঁ, বলেছিল। এখনো খোঁজা শুরু করিনি। আসলে ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনি বলায় মনে পড়ল।'

'আপনাকে খুঁজতে হবে না। মেয়ে পাওয়া গেছে।'

'বাঁচা গেল। তিরিশ লক্ষ লোকের মাঝখান থেকে লুৎফাকে খুঁজে পাওয়া সমস্যা হত।'

'আপনাকে সে যেদিন বলল, সেদিন দুপুরেই মেয়ে উপস্থিত। ব্যাপারটা যে পুরোপুরি কাকতালীয় তাতে কি আপনার কোন সন্দেহ আছে?'

'কোন সন্দেহ নেই।'

'আপনি নিশ্চয়ই দাবি করেন না যে আপনার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দিয়ে মেয়েকে নিয়ে এসেছেন?'

'পাগল হয়েছেন!'

'বুয়ার ধারণা আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দিয়ে কাজটা করা হয়েছে। বাদলেরও তাই ধারণা।'

'কার কি ধারণা তাতে কি যায় আসে? মেয়েটাকে পাওয়া গেছে এটাই বড় কথা।'

ইরা কঠিন গলায় বলল, কে কি ভাবছে তাতে অনেক কিছুই যায় আসে। এই ভাবেই সমাজে বুজরুক তৈরি হয়। আপনার মত মানুষরাই সোসাইটির ইকুইলিব্রিয়াম

নষ্ট করেন। বাদলের মাথা তো আপনি আগেই খারাপ করেছিলেন, এখন বুয়ার মাথাও খারাপ করলেন।

'তাই না-কি!'

'হ্যাঁ তাই। বাদলের মাথা যে আপনি কি পরিমাণ খারাপ করেছেন সেটা কি আপনি জানেন?'

'না, জানি না।'

'দু-একদিনের ভেতর একবার এসে দেখে যান। ব্রাইট একটা ছেলে। বাবা-মা'র কত আশা ছেলেটাকে নিয়ে . . . আপনি তাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলেছেন। ফালতু বুজরুকি। উদ্ভট উদ্ভট কথা। মহাপুরুষ মহাপুরুষ খেলা। রাতদুপুরে রাস্তায় হাঁটলেই মানুষ মহাপুরুষ হয়ে যায়?'

ইরা রাগে কাঁপছে। মেয়েটা এতটা রেগেছে কেন বুঝতে পারছি না। এত রাগার তো কিছু নেই। আমার বুজরুকিতে তার কি যায় আসে?

ইরা বলল, আমি এখন যাব।

'চা-টা কিছু খাবেন না?'

'না। আপনি দয়া করে বাদলকে একটু দেখে যাবেন। ওর অবস্থা দেখে আমার কান্না পাচ্ছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে আসলে আপানার শাস্তি হওয়া উচিত। কঠিন শাস্তি।'

ইরা গট গট করে বের হয়ে গেল। মেয়েটা বেশ সুন্দর। রেগে যাওয়ায় আরো সুন্দর লাগছে। যে রাগের সঙ্গে ঘৃণা মেশানো থাকে সেই রাগের সময় মেয়েদের সুন্দর দেখায় না। যে রাগের সঙ্গে সামান্যতম হলেও ভালবাসা মেশানো থাকে সেই রাগ মেয়েদের রূপ বাড়িয়ে দেয়। ইরা কি সামান্য ভালবাসা আমার জন্যে বোধ করা শুরু করেছে? এটা আশংকার কথা। ভালবাসা বটগাছের মত। ক্ষুদ্র বীজ থেকে শুরু হয়। তারপর হঠাৎ একদিন ডালপালা মেলে দেয়, ঝুড়ি নামিয়ে দেয়।

ইরার ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। বাদলদের বাড়িতে ভুলেও যাওয়া যাবে না। ইরা মেসের ঠিকানা বের করে চলে এসেছে কি ভাবে সেটাও এক রহস্য। ঠিকানা তার জানার কথা না। ঐ বাড়ির কেউ জানে না।

রাতে খেতে গিয়ে শুনি বদরুল সাহেব আমার খাওয়া খেয়ে চলে গেছেন। মেসের বাবুর্চি খুবই বিরক্তি প্রকাশ করল।

'রোজ এই কাম করে। আফনের খাওন খায়।'

'ঠিকই করেন। আমি তাঁকে বলে দিয়েছি। এখন থেকে তিনিই খাবেন।'

'আপনি খাবেন না?'

'আমি কয়েকদিন বাইরে থাকব।'

ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমানোর আলাদা আনন্দ আছে। সেই আনন্দ পাবার উপায় হচ্ছে

— পেট ভর্তি করে পানি খেয়ে ঘুমুতে যাওয়া। পেট ভর্তি পানির কারণেই হোক কিংবা অন্য কারণেই হোক — নেশার মত হয়। ঝিমুনি আসে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমের সময়ের স্বপ্নগুলি হয় অন্যরকম। তবে আজ তা হবে না। রাতে না খেলেও দিনে খেয়েছি। ক্ষুধার্ত ঘুমের স্বরূপ বুঝতে হলে সারাদিন অভুক্ত থাকার পর পেট ভর্তি করে পানি খেয়ে ঘুমুতে যেতে হয়। নেশার ভাবটা হয় তখন।

বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। বদরুল সাহেব মিহি গলায় ডাকলেন, হিমু ভাই। হিমু ভাই। আমি উঠে দরজা খুললাম।

বদরুল সাহেব লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে এক ঠোঙ্গা মুড়ি, খানিকটা গুড়। আমি বললাম, ব্যাপার কি বলুন তো?

'শুনলাম আপনি খেতে গিয়েছিলেন। এদিকে আমি ভেবেছি আপনি আসবেন না...'

'ও, এই ব্যাপার!'

'খুব লজ্জায় পড়েছি হিমু ভাই। আপনার জন্যে মুড়ি এনেছি।'

'ভাল করেছেন। আজ রাতটা উপোস দেব বলে ঠিক করেছি। মাঝে মাঝে আমি উপোস দেই। আপনি গুড়-মুড়ি খান। আমি মুড়ি খাওয়ার শব্দ শুনি।'

'কিছু খাবেন না হিমু ভাই?'

'না। তারপর ঐ দিন কি হল বলুন — পুলিশরা যত্ন করে খাইয়েছিল?'

'যত্ন বলে যত্ন। এক হোটেলে নিয়ে গেছে। পোলাও, খাসির রেজালা, হাঁসের মাংস, সব শেষে দৈ মিষ্টি। এলাহী ব্যাপার। খুবই যত্ন করেছে। হাঁসের মাংসটা অসাধারণ ছিল। এত ভাল হাঁসের মাংস আমি আমার জীবনে খাইনি। বেশি করে রসুন দিয়ে ভুনা ভুনা করেছে। এই সময়ের হাঁসের মাংসে স্বাদ হয় না। হাঁসের মাংস শীতের সময় খেতে হয়। তখন নতুন ধান ওঠে। ধান খেয়ে খেয়ে হাঁসের গায়ে চর্বি হয়। আপনার ভাবীও খুব ভাল হাঁস রাঁধতে পারে। নতুন আলু দিয়ে রাঁধে। আপনাকে একবার নিয়ে যাব। আপনার ভাবীর হাতের হাঁস খেয়ে আসবেন।'

'কবে নিয়ে যাবেন?'

'এই শীতেই নিয়ে যাব। আপনার ভাবীকে চিঠিতে আপনার কথা প্রায়ই লিখি তো। তারও খুব শখ আপনাকে দেখার। একবার আপনার অসুখ হল — আপনার ভাবীকে বলেছিলাম দোয়া করতে। সে খুব চিন্তিত হয়েছিল। কোরান খতম দিয়ে বসে আছে। মেয়ে মানুষ তো, অল্পতে অস্থির হয়।'

'আপনার চাকরির কি হল? শনিবারে হবার কথা ছিল না? গিয়েছিলেন?'

বদরুল সাহেব চুপ করে রইলেন। আমি বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললাম, যাননি?

'জ্বি, গিয়েছিলাম। ইয়াকুব ভুলে গিয়েছিল।'

'ভুলে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। সে তো একটা কাজ নিয়ে থাকে না। অসংখ্য কাজ করতে হয়। তার পি-এ সে ফাইল দেয়নি। কাজেই ভুলে গেছে।'

'এখন কি ফাইল দিয়েছে?'

'এখন তো দেবেই। পি-এ-কে ডেকে খুব ধমকাধমকি করল। আমার সামনেই করল। বেচারার জন্যও মায়া লাগছিল। সে তো আর শত্রুতা করে আমার ফাইল আটকে রাখেনি। ভুলে গেছে। মানুষ মাত্রেরই তো ভুল হয়।'

'ইয়াকুব সাহেব এখন কি বলছেন? কবে নাগাদ হবে?'

'তারিখ-টারিখ বলেনি। আরেকটা বায়োডাটা জমা দিতে বলেছে।'

'দিয়েছেন?'

'হুঁ।'

'এবারো কি ফাইলের উপর আর্জেন্ট লিখে দিয়েছেন?'

'হুঁ।'

'আবার কবে খোঁজ নিতে বলেছেন।'

'বলেছে বার বার এসে খোঁজ নেবার দরকার নেই। ওপেনিং হলেই চিঠি চলে আসবে।'

'সেই চিঠি কবে নাগাদ আসবে তা কি বলেছে?'

'খুব তাড়াতাড়িই আসবে। আমি আমার অবস্থার কথাটা বুঝিয়ে বলেছি। চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেললাম যে অন্যের খাবার খেয়ে বেঁচে আছি। শুনে সে খুবই মন খারাপ করল।'

'বুঝলেন কি করে যে মন খারাপ করেছে? মুখে কিছু বলেছে?'

'কিছু বলেনি। চেহারা দেখে বুঝেছি।'

'আমার কি মনে হয় জানেন বদরুল সাহেব, আপনার অন্যান্য জায়গাতেও চাকরির চেষ্টা করা উচিত। ইয়াকুব সাহেবের উপর আমার তেমন ভরসা হচ্ছে না।'

'ভরসা না হবার কিছু নেই হিমু ভাই। স্কুল জীবনের বন্ধু। আমার সমস্যা সবটাই জানে। আমার ধারণা এক সপ্তাহের মধ্যেই চিঠি পাব।'

'যদি না পান?'

'না পেলে অফিসে গিয়ে দেখা করব। বার বার যেতে লজ্জাও লাগে। নানান কাজ নিয়ে থাকে। কাজে ডিসটার্ব হয়।'

ঘর অন্ধকার। কচ কচ শব্দ হচ্ছে। বদরুল সাহেব মুড়ি খাচ্ছেন।

'হিমু ভাই!'

'জ্বি।'

'ফ্রেস মুড়ি। খেয়ে দেখবেন?'

'আপনি খান।'

'মুড়ির আসল স্বাদও পাওয়া যায় শীতকালে। আপনার ভাবী আবার মুড়ি দিয়ে

মোয়া বানাতে পারে। কি জিনিস তা না খেলে বুঝবেন না।'

'একবার খেয়ে আসব।'

'অবশ্যই খেয়ে আসবেন।'

'বদরুল সাহেব!'

'জ্বি।'

'আমি কিছুদিন অন্য জায়গায় গিয়ে থাকব। কেউ আমার খোঁজে এলে বলে দেবেন মেস ছেড়ে দিয়েছি। মিথ্যা কথা বলতে পারেন তো?'

'আপনি বললে — মিথ্যা বলব। আপনার জন্যে করব না এমন কাজ নাই। শুধু মানুষ খুনটা পারব না।'

মানুষ খুন করতে হবে না শুধু একটু মিথ্যা বলবেন। ইরা নামের একটা মেয়ে আমার খোঁজে আসতে পারে, তাকে বলবেন আমি সুন্দরবনে চলে গেছি। মাসখানিক থাকব। তবে রূপা এলে আমি কোথায় আছি সেই ঠিকানা দিয়ে দেবেন।'

'ঠিকানাটা কি?'

'আমার এক দূর সম্পর্কের খালা আছে। রেশমা। গুলশানে থাকে। গুলশান দুই নম্বর। বাড়ির নাম গনি প্যালেস। ঐ প্যালেসে সপ্তাহখানিক লুকিয়ে থাকব। না থাক, ওকেও সুন্দরবনের কথাই বলবেন।'



গুলশান এলাকায় সবচে' বড়, সবচে' কুৎসিত বাড়িটা রেশমা খালার। খালু সাহেব গনি মিয়ার সিক্সথ সেন্স ছিল অকল্পনীয়। তিনি সস্তা গণ্ডার সময়ে গুলশানে দু'বিঘা জমি কিনে ফেলে রেখেছিলেন। তাঁর বেকুবির উদাহরণ হিসেবে তখন এই ঘটনার উল্লেখ করা হত। যার সঙ্গেই দেখা হত রেশমা খালা বলতেন, বেকুবটার কাণ্ড শুনেছ? জঙ্গল কিনে বসে আছে।

খালু সাহেবের চেহারা বেকুবের মতই ছিল। অন্যের কথা শোনার সময় আপনাআপনি মুখ হা হয়ে যেত। ব্যবসা বিষয়ে যেসব কথা বলতেন সবই হাস্যকর বলে মনে হত। যে বছর দেশে পেয়াজের প্রচুর ফলন হল এবং পেয়াজের দাম পড়ে গেল সে বছরই তিনি পেয়াজের ব্যবসায় চলে এলেন। ইণ্ডিয়া থেকে পেয়াজ আনার জন্য এলসি খুললেন। অন্য ব্যবসায়ীরা হাসল। হাসারই কথা। রেশমা খালা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি না-কি বেকুবের মত পিয়াজের ব্যবসায় নামছ? যত দিন যাচ্ছে তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি তো ততই চলে যাচ্ছে। আগে মাঝে মধ্যে হা করে থাকতে, এখন দেখি সারাক্ষণই হা করে থাক। পেয়াজের ব্যবসার এই বুদ্ধি তোমাকে কে দিল?

'কেউ দেয় নাই। নিজেরই বুদ্ধি। পেয়াজের ফলন খুব বেশি হয়েছে তো, চাষী ভাল দাম পায় নাই। এই জন্য আগামী বছর পেয়াজের চাষ হবে কম। পেয়াজের দাম হবে আকাশছোঁয়া।'

'তোমার মাথা!'

'দেখ না কি হয়।'

গনি সাহেব যা বললেন তাই হল। পরের বছর পেয়াজ দেশে প্রায় হলই না।

রেশমা খালা হতভম্ব। তিনি বলে বেড়াতে লাগলেন, বেকুব মানুষ তো। বেকুব মানুষের উপর আল্লাহর রহমত থাকে। যে ব্যবসা-ই করে দু'হাতে টাকা আনে। টাকা ব্যাংকে রাখার জায়গা নেই, এমন অবস্থা।

রেশমা খালার আফসোসের সীমা নেই — বেকুব স্বামী টাকা রোজগার করাই শিখেছে, খরচ করা শিখেনি। তিনি আফসোসের সঙ্গে বলেন, টাকা খরচ করতে তো বুদ্ধি লাগে। বুদ্ধি কোথায় যে খরচ করবে? খালি জমাবে।

গনি সাহেব মাছ-গোশত এক সঙ্গে খান না। ছোটবেলায় তাঁর মা বলেছেন, মাছ-

গোশত এক সঙ্গে খেলে পেটের গণ্ডগোল হয়। সেটাই মাথায় রয়ে গেছে। গাড়িতে চড়তে পারেন না, বেবী টেক্সিতেও না। পেট্রোলের গন্ধ সহ্য হয় না। বমি হয়ে যায়। লোকজনের গাড়ি থাকে। গনি সাহেবের আছে রিক্সা। সেই রিকশার সামনে–পেছনে ইংরেজিতে লেখা "Private"

সেই রিকশায় কোথাও যেতে হলে রেশমা খালার মাথা কাটা যায়। সাধারণ রিকশায় চড়া যায়, কিন্তু 'প্রাইভেট' লেখা রিকশায় কি চড়া যায়? লোকজন কেমন কেমন চোখে তাকায়।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য রেশমা খালা গাড়ি কিনলেন। খালু সাহেব নাকে অডিকোলন ভেজানো রুমাল চাপা দিয়ে কয়েকবার সেই গাড়িতে চড়লেনও, তারপর আবার ফিরে গেলেন প্রাইভেট রিকশায়। তাঁতে তাঁর ব্যবসা–বাণিজ্যের কোন অসুবিধা হল না। ব্যবসা–বাণিজ্য হু–হু করে বাড়তে লাগল। কাপড়ের কল দিলেন, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি করলেন।

রেশমা খালার শুধু আফসোস — খালি টাকা, আর টাকা। কি হবে টাকা দিয়ে? একবার দেশের বাইরে যেতে পারলাম না। এমন এক বেক্কুব লোকের হাতে পড়েছি, আকাশে প্লেইন দেখলে তার বুক ধড়ফড় করে। এই লোককে নিয়ে জীবনে কোনদিন কি বাইরে যেতে পারব? কোন দিন পারব না। লোকে ঈদের শপিং করতে সিঙ্গাপুর যায়, ব্যাংকক যায়। আর আমি কোটিপতির বউ, আমি যাই গাউছিয়ায়।

খালু সাহেবের মৃত্যুর পর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন যে কি পরিমাণ হয়েছে সেটা তাঁর বাড়িতে ঢুকে দেখলাম।

পুরোন বাড়ি ভেঙে কি হুলুস্থুল করা হয়েছে। মার্বেল পাথরের সিঁড়ি। ময়লা জুতা পায়ে সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে ভয় লাগে। ঘরে ঘরে ঝাড়বাতি। ড্রয়িংরুমে ঢুকে আমি হতভম্ব গলায় বললাম, সর্বনাশ! রেশমা খালা আনন্দিত গলায় বললেন, বাড়ি রিনোভেশনের পর তুই আর আসিসনি, তাই না?

'না। তুমি তো ইন্দ্রপুরী বানিয়ে ফেলেছ।'

'আর্কিটেক্টটা ভাল পেয়েছিলাম। টাকা অনেক নিয়েছে। ব্যাটা কাজ জানে, টাকা তো নিবেই। ভেতরের সব কাজ দিয়েছি ইন্টারনাল ডিজাইনারকে। আমেরিকা থেকে পাশ করা ডিজাইনার। ফার্নিচার–টার্নিচার সব তার ডিজাইন। দেয়ালে যে পেইনটিংগুলি দেখছিস সেগুলিও কোনটা কোথায় বসবে সে–ই ঠিক করে দিয়েছে।

'এই বাড়িতে তো খালা আমি থাকতে পারব না। দম বন্ধ হয়ে মরে যাব। এখনি শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।'

রেশমা খালা আনন্দিত গলায় বললেন, তোর ঘর দেখিয়ে দি। ঘর দেখলে তুই আর যেতে চাইবি না। গেস্টরুম আছে দু'টা। তোর যেটা পছন্দ সেটাতে থাকবি। একটায় ভিক্টোরিয়ান ফার্নিচার, অন্যটায় মডার্ন। তোর কোন ধরনের ফার্নিচার পছন্দ? দু'টা ঘরই দেখ। যেটা ভাল লাগে। দু'টাতেই এ্যাটাচড বাথ। দু'টাতেই এসি।

'এত বড় একটা বাড়িতে একা থাকো?'

'একা তো থাকতেই হবে, উপায় কি? গোষ্ঠির আত্মীয়স্বজন এনে ঢুকাব? শেষে ঘুমের মধ্যে মেরে রেখে যাবে। সবাই আছে টাকার ধান্দায়। মানুষ দেখলেই আমার ভয় লাগে।'

'আমাকে ভয় লাগছে না?'

'না, তোকে ভয় লাগছে না। তোকে ভয় লাগবে কেন? শোন্, কোন্ বেলা কি খেতে চাস বাবুর্চিকে বলবি। রেঁধে দেবে। দু'জন বাবুর্চি আছে। ইংলিশ ফুডের জন্যে একজন, বাঙালী ফুডের জন্যে একজন।'

'চাইনীজ ফুড কে রাঁধে?'

'ইংলিশ বাবুর্চিই রাঁধে। ও চাইনীজ ফুডের কোর্সও করেছে। রাতে কি খাবি — চাইনীজ?'

'তুমি যা খাও তাই খাব।'

'তোর যখন চাইনীজ ইচ্ছা হয়েছে তখন চাইনীজই খাব। দাঁড়া, বাবুর্চিকে বলে দি। এই বাড়ির মজা কি জানিস — কথা বলার জন্যে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে হবে না। ইন্টারকম আছে। বোতাম টিপলেই হল। আয়, তোকে ইন্টারকম ব্যবহার করা শিখিয়ে দি।'

ইন্টারকম ব্যবহার করা শিখলাম। বাথরুমের গরম পানি, ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা শিখলাম। এসি চালানো শিখলাম। রিমোট কনট্রোল এসি। বিছানায় শুয়ে শুয়েও বোতাম টিপে এসি অন করা যায়। ঘর আপনাআপনি ঠাণ্ডা–গরম হয়।

'তোর গান–বাজনার শখ আছে? একটা মিউজিক রুম রয়েছে, ক্যাসেট ডেক, সিডি প্লেয়ার সব আছে।'

'আর কি আছে?'

'প্রেয়ার রুম আছে।'

'সেটা কি?'

'প্রার্থনা ঘর। নামাজ পড়তে ইচ্ছা হলে নামাজ পড়বি। দেখবি? দেখতে হলে অজু করে ফেল। অজু ছাড়া নামাজ ঘরে ঢোকা নিষেধ।'

'নামাজঘরে কি আছে? জায়নামাজ, টুপি?'

'আরে না। জায়নামাজের দরকার নেই। মেঝে সবুজ মার্বেলের। রোজ একবার সাধারণ পানি দিয়ে মোছা হয়, তারপর গোলাপ জল মেশানো পানি দিয়ে মোছা হয়। চারদিকে কোরান শরীফের বিভিন্ন আয়াত ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছি। ইসলামিক আর্চ ডিজাইন। এই ডিজাইন আবার অন্য একজনকে দিয়ে করিয়েছি।'

'নামাজ পড়ছ?'

'শুরু করব। ছোটবেলায় কোরান শরীফ পড়া শিখেছিলাম, তারপর ভুলে গেছি। কথায় বলে না — অনভ্যাসে বিদ্যা নাশ। ঐ হয়েছে। একজন মওলানা রেখে কোরান

শরীফ পড়া শিখে তারপর নামাজ ধরব। আয়, নামাজঘর দেখে যা। বাংলাদেশে এই জিনিস আর কারো ঘরে নাই। এখন আবার অনেকেই আমার ডিজাইন নকল করছে। প্রেয়ার রুম বানাচ্ছে। নকলবাজের দেশ। ভাল কিছু করলেই নকল করে ফেলে।'

'তোমার বাড়িতে বার নেই খালা?'

'আছে, থাকবে না কেন? বার ছাড়া কোন মডার্ন বাড়ির ডিজাইন হয়? ছাদের চিলেকোঠায় বার। তোর আবার ঐসব বদ অভ্যাস আছে নাকি? থাকলে ভুলে যা। আমার বাড়িতে বেলেল্লাপনা চলবে না। যা, অজু করে আয়, তোকে নামাজ ঘর দেখিয়ে আনি।'

অজু করে নামাজঘর দেখতে গেলাম। খালা মুগ্ধ গলায় বললেন, ঘরে কোন বাল্ব বা টিউব লাইট দেখছিস?'

'না।'

'তারপরেও ঘর আলো হয়ে আছে না?'

'হ্যাঁ।'

'এর নাম কনসিলড লাইটিং। বাঁদিকের দেয়ালে দেখ একটা সুইচ, টিপে দে।'

'টিপলে কি হবে?'

'টিপে দেখ না। বিসমিল্লাহ বলে টিপবি।'

আমি বিসমিল্লাহ বলে সুইচ টিপে আতংক নিয়ে অপেক্ষা করছি। আমার ধারণা, সুইচ টেপামাত্র নামাজঘর পরোপুরি পশ্চিম দিকে ঘুরবে। তা হল না। যা হল সেটাও কম বিস্ময়কর না। কোরান তেলাওয়াত হতে লাগল।

রেশমা খালা বললেন, পুরো কোরান শরীফ রেকর্ড করা আছে। একবার বোতাম টিপে দিলে অটোমেটিক কোরান খতম হয়ে যায়।

'সেই কোরান খতমের সোয়াব তো তুমি পাও না, সোয়াব পায় তোমার ক্যাসেট রেকর্ডার। এই ক্যাসেট রেকর্ডারের বেহেশতে যাবার খুবই উঁচু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।'

'খবরদার, নামাজঘরে কোন ঠাট্টা-ফাজলামি করবি না।'

নামাজঘরে কোরান পাঠ চলতে লাগল। খালা আমাকে ছাদের চিলেকোঠায় বার দেখাতে নিয়ে গেলেন। শ্বেত পাথরের কাউন্টার টেবিল। পেছনে আলমারী ভর্তি নানা আকারের এবং নানা রঙের বোতল ঝিকমিক করছে।

'কালেকশান কেমন, দেখেছিস?'

'হুঁ। আক্কেল গুড়ুম অবস্থা। শুধু আক্কেল গুড়ুম না, একই সঙ্গে বে-আক্কেল গুড়ুম।'

'বে-আক্কেল গুড়ুম আবার কি?'

'কথার কথা আর কি! করেছ কি তুমি? দুনিয়ার বোতল জোগাড় করে ফেলেছ!'

'খাওয়ার লোক নেই তো। শুধু জমছে।'

'তোমার এখানে সবচে' দামী বোতল কোন্‌টা খালা?'

'পেটমোটা বোতলটা — ঐ যে দেখে মনে হচ্ছে মাটির বোতল। পঞ্চাশ বছরের পুরানো রেড ওয়াইন। ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের বিশেষ বিশেষ উৎসবে এই জিনিস খাওয়া হয়।'

'দাম কত তা তো বললে না।'

'দাম শোনার দরকার নেই। দাম শুনলে তুই ভিরমি খাবি।'

'এম্নিতেই ভিরমি খাচ্ছি। আজ আর আমার ভাত খেতে হবে না। ভিরমি খেয়ে পেট ভরে গেছে।'

আনন্দে খালার মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল। আমার মুখ হয়ে গেল অন্ধকার। এক সপ্তাহ এ বাড়িতে থাকা যাবে না। আজই পালাতে হবে। রাতটা কোনমতে পার করে সকালে সূর্য ওঠার আগেই 'হ্যাপিশ'।

'আয়, লাইব্রেরি ঘর দেখি।'

'আবার লাইব্রেরি ঘরও আছে?'

'বলিস কি! লাইব্রেরি ঘর থাকবে না? লাইব্রেরি ঘর পুরোটা কাঠের করেছি। মেঝেও কাঠের। সব রকম বইপত্র আছে; ঘন্টার পর ঘন্টা তুই বই পড়ে কাটাতে পারবি। নিউ মার্কেটের এক দোকানের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করে রেখেছি — ভাল ভাল বই এলেই পাঠিয়ে দেয়। লাইব্রেরি ঘরে কম্পিউটার বসিয়েছি। তুই কম্পিউটার চালাতে জানিস?'

'না।'

'আমিও জানি না। যাদের কাছ থেকে কিনেছি ওদের বলা আছে, অবসর পেলেই খবর দেব, ওরা এসে শিখিয়ে দেবে।'

'অবসর পাচ্ছ না?'

'অবসর পাব কোথায়? সকালটায় একটু অবসর থাকে। দুপুরে খাওয়ার পর ঘুমুতে যাই — সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমাই। সারারাত জেগে থাকি — দুপুরে না ঘুমালে চলবে কেন?'

'সারারাত জেগে থাক কেন?'

'ঘুম না হলে জেগে না থেকে করব কি?'

'ঘুম হয় না?'

'না।'

'ডাক্তার দেখিয়েছ?'

'ডাক্তারের পেছনে জলের মত টাকা খরচ করেছি। এখনো করছি। এখনো চিকিৎসা চলছে। সাইকিয়াট্রিস্ট চিকিৎসা করছেন।'

'তারা কিছু পাচ্ছে না?'

'পাচ্ছে কি পাচ্ছে না ওরাই জানে। ওদের চিকিৎসায় লাভ হচ্ছে না। এখন তুই হলি ভরসা।'

'আমি ভরসা মানে? আমি কি ডাক্তার না-কি?'

'ডাক্তার না হলেও তোর নাকি অনেক ক্ষমতা। সবাই বলে। তুই আমাকে রাতে ঘুমের ব্যবস্থা দে। তুই যা চাইবি তা-ই পাবি। ওয়াইনের ঐ বোতলটা তোকে না হয় দিয়ে দেব।'

পঞ্চাশ বছরের পুরানো মদের বোতল পাব এই আনন্দ আমাকে তেমন অভিভূত করতে পারল না। আমার ভয় হল এই ভেবে যে রেশমা খালা আমার উপর ভর করেছেন। সিন্দাবাদের ভূত সিন্দাবাদের উপর একা চেপেছিল। রেশমা খালা আমার উপর একা চাপেন নি, তাঁর পুরো বাড়ি নিয়ে চেপেছেন। একদিনেই আমার চ্যাপ্টা হয়ে যাবার কথা। চ্যাপ্টা হওয়া শুরু করেছি।

'হিমু!'

'জ্বি।'

'আমার ব্যাপারটা কখন শুনবি?'

'তোমার কোন ব্যাপার?'

'ওমা, এতক্ষণ কি বললাম — রাতে ঘুম না হওয়ার ব্যাপারটা।'

'একসময় শুনলেই হবে। তাড়াতো কিছু নেই।'

'এখন তুই কি করবি।'

'বুঝতে পারছি না। নিজের ঘরে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব বলে ভাবছি। যে বিছানা বানিয়েছ শুতে সাহসও হচ্ছে না।'

'রেশমা খালা বললেন, বিছানা এমন কিছু না। সাধারণ ফোমের তোষক। তবে বালিশ হচ্ছে পাখির পালকের।'

'বল কি?'

'খুব এক্সপেনসিভ বালিশ। জ্যান্ত পাখির পাখা থেকে এইসব বালিশ তৈরি হয়। মরা পাখির পালকে বালিশ হয় না।'

'একটা পালকের বালিশের জন্যে ক'টা পাখির পালক লাগে?'

'কি করে বলব ক'টা — কুড়ি পঁচিশটা নিশ্চয়ই লাগে।'

'একটা বালিশের জন্যে তাহলে পঁচিশটা পাখির আকাশে ওড়া বন্ধ হয়ে গেলো?'

'আধ্যাত্মিক ধরনের কথা বলবি না তো হিমু। এইসব কথা আমার কাছে ফাজলামীর মত লাগে।'

'ফাজলামীর মত লাগলে আর বলব না।'

'যা, তুই রেস্ট নে। চা কফি কিছু খেতে চাইলে ইন্টারকমে বলে দিবি।'

'তুমি কি বেরুচ্ছ?'

'হুঁ। বললাম না সকালে আমি একটু বের হই। দিন রাত ঘরে বসে থাকলে দম বন্ধ হয়ে আসবে না। তুই তো এখন আর বের হবি না?'

'না।'

'তাহলে তালা দিয়ে যাই।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, তালা দিয়ে যাবে মানে?

খালা আমার চেয়েও অবাক হয়ে বললেন, তুই আমার মূল বাড়িতে থাকবি তোকে তালা দিয়ে যাব না? লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস চারদিকে।

'ঘরে যদি আগুন টাগুন লেগে যায় তখন কি হবে?'

'খামাখা আগুন লাগবে কেন? আর যদি লাগে প্রতি ফ্লোরে ফায়ার এক্সটিংগুইসার আছে।'

'তালা দেয়া অবস্থায় কতক্ষণ থাকব।'

'আমি না আসা পর্যন্ত থাকবি। আমি তো আর সারাজীবনের জন্যে চলে যাচ্ছি না। ঘন্টাখানিক ঘোরাঘুরি করে চলে আসব। সামান্য কিছুক্ষণ তালাবন্ধ থাকবি এতেই মুখ চোখ শুকিয়ে কি করে ফেলেছিস!'

'খালা, আমি হচ্ছি মুক্ত মানুষ। এটাই সমস্যা।'

'বিছানায় শুয়ে বই টই পড়, টিভি দেখ। আমি তোকে কফি দিতে বলে যাচ্ছি।'

আমি বিছানায় শুয়ে শুয়েই ঘটাং ঘটাং শব্দে তালা দেয়ার আওয়াজ পেলাম। এ বাড়ির সব কিছু আধুনিক হলেও তালাগুলি সম্ভবত মান্ধাতার আমলের। বড্ড শব্দ হয়।

পালকের বিছানায় মাথা রেখে শুয়ে আছি। আমাকে কফি দিয়ে গেছে। চাইনীজ খাবার কি খাব বাবুর্চি জানতে এসেছিল, হাতে নোট-বুক, পেন্সিল। আমি গম্ভীর গলায় বলেছি আরশোলা দিয়ে হট এন্ড সাওয়ার করে একটা স্যুপ খাব। চাইনীজরা শুনেছি আরশোলার স্যুপ খুব সখ করে খায়। আমি কখনো খেয়ে দেখিনি।

বাবুর্চি হতভম্ব গলায় বলল, স্যারের কথা বুঝতে পারলাম না। কিসের স্যুপ?

'ককরোচ স্যুপ। সঙ্গে মাশরুম দিতে পারেন, বেবী কর্ণ দিবেন। সয়াসস অল্প দেবেন। আরশোলার গন্ধ মারার জন্যে যতটুক দরকার ঠিক ততটুক, বেশিও না কমও না।'

'আমি স্যার আসলেই আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে না পারলে বিদায় হয়ে যান।'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

তালাবন্ধ বাড়িতে পড়ে আছি। আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি কাজ করতে শুরু করেছে। সময় থেমে গেছে। টাইম ডাইলেশন। তালাবন্ধ অবস্থায় যে এর আগে থাকিনি তা না। হাজতে কাটানো রাতের সংখ্যা কম না। তবে হাজত তালাবন্ধ থাকবে এটা স্বীকৃত সত্য বলে খারাপ লাগে না। তালা খোলা অবস্থায় হাজতে বসে থাকাটা বরং অস্বস্তিকর। কিন্তু স্বর্গপুরীতে তালাবন্ধ অসহনীয়।

শুয়ে শুয়ে ভাবছি বেহেশত কেমন হবে? সেখানেও কি এ রকম তালা সিস্টেম থাকবে। না-কি বেহেশতবাসীরা মুক্ত স্বাধীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে পারবে। কারো ইচ্ছা

হল সে দোজখে তার কোন পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে এল। বেহেশতের বর্ণনা ভাল মত জেনে নিতে হবে। খালার নামাজ ঘরে প্রচুর ধর্মের বই-টই আছে। সেখানে বেহেশত সম্পর্কে কি লেখা আছে পড়তে হবে।

কফি খাচ্ছি, কফিতে কোন স্বাদ পাচ্ছি না। স্বাদ যেমন নেই, গন্ধও নেই। একটু পর পর চোখ চলে যাচ্ছে ঘড়ির দিকে। ঘড়ি মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি বন্ধ হয়ে গেছে।

আমার বিখ্যাত বাবা আমাকে বন্দি থাকার ট্রেনিং অতি শৈশবে দিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মনে হয়েছিল মহাপুরুষ বানানোর জন্যে এই ট্রেনিং অতি জরুরি। বন্দি না থাকলে 'মুক্তি'র স্বরূপ বোঝা যায় না। কাজেই একদিন আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে দিলেন — তখন আমি ক্লাস ফোরে পড়ি। যতটা অবাক হওয়ার কথা ততটা হলাম না। বাবার পাগলামীর সঙ্গে ততদিনে পরিচিত হয়ে পড়েছি। আমার ধারণা সন্ধ্যা নাগাদ তালা খোলা হবে। আতংকে অস্থির হয়ে লক্ষ্য করলাম সন্ধ্যার পর পর বাবা বাড়ি ছেড়েই চলে গেলেন। যাবার সময় মেইন সুইচ অফ করে দিলেন। একেবারে কবরের অন্ধকার। ঐটা ছিল আমার বাবার ভয় জয় করা ট্রেনিং-এর প্রাথমিক অংশ। তাঁর ডায়েরীতে তিনি লিখেছিলেন —

> "অদ্য রজনীতে হিমালয়কে ভয় জয় করিবার প্রস্তুতিসূচক ট্রেনিং দেওয়া হইবে। মানুষের প্রধান ভয় অন্ধকারকে। যে অন্ধকারের স্মৃতি সে অন্য কোন ভুবন হইতে লইয়া আসিয়াছে। অন্ধকারকে জয় করার অর্থ সমস্ত ভয় জয় করা। অদ্যকার অন্ধকার জয় করা বিষয়ক প্রাথমিক ট্রেনিং হিমালয় কিভাবে গ্রহণ করিবে বুঝিতে পারিতেছি না। এই শক গ্রহণ করিবার মানসিক শক্তি কি তাহার আছে? বুঝিতে পারিতেছি না। কাহাকেও বাহির হইতে দেখিয়া তাহার মানসিক শক্তি সম্পর্কে ধারণা করা যায় না। সেই দিব্য দৃষ্টি প্রকৃতি মানব সম্প্রদায়কে দেয় নাই . . . "

আমি ইন্টারকম টিপে বাবুর্চিকে ডাকলাম। ইন্টারভ্যু নেয়ার ভঙ্গিতে বললাম, কি নাম?

'ইদ্রিস!'

শুরুতে তাকে আপনি করে বলেছিলাম, এখন তুমি।

'শোন ইদ্রিস! এ বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে? বাথরুম থেকে পাইপ বেয়ে নেমে পড়া বা এ জাতীয় কিছু?'

'জ্বি না।'

'ছাদে উঠে, ছাদ থেকে অন্য ছাদে লাফিয়ে যাওয়া যায় না?'

'জ্বি-না।'

'টেলিফোন নিয়ে আস। দমকল অফিসে টেলিফোন করে দি। ওরা তালা খুলে উদ্ধার করবে।'

'টেলিফোন নাই স্যার।'

'টেলিফোন নাই মানে?'

'এই বাড়িতে সব আছে টেলিফোন নাই। টেলিফোনে লোকজন বিরক্ত করে। ম্যাডামের ভাল লাগে না।'

'ও, আচ্ছা।'

'স্যার, আরেক কাপ কফি এনে দেই। চিন্তার কিছু নাই ম্যাডাম চলে আসবেন। উনি বেশীক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকেন না। চলে আসেন। কফি দিব স্যার?'

'দাও।'

বাবুর্চি কফি এনে দিল। আমি কফি খেয়ে রেশমা খালার অপেক্ষা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। সেই ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখি রাত হয়ে গেছে। ঘর অন্ধকার।

'কিরে, ঘুম ভেঙেছে?'

রেশমা খালা ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালালেন। তিনি মাথার নকল চুল খুলে ফেলেছেন। তাঁকে মোটামুটি বীভৎস দেখাচ্ছে। তাঁর মাথার আদি চুলের এই অবস্থা কে জানত। কিছু আছে কিছু নেই। যেখানটায় নেই সেখানটার মাথার হলুদ চামড়া চকচক করছে।

'ঘরে ফিরে দেখি তুই মরার মত ঘুমুচ্ছিস। তাই আর ঘুম ভাঙালাম না। ঘুমের মূল্য কি তা আর কেউ না জানুক আমি তো জানি। এতক্ষণ ধরে কেউ ঘুমুতে পারে তাও জানতাম না। তোর কোন অসুখ বিসুখ নেই তো?'

'ক'টা বাজে খালা?'

'নটার কাছাকাছি। তুই এক নাগাড়ে প্রায় দশঘন্টা ঘুমুলি। ক্ষিধে লেগেছে নিশ্চয়ই। হাত-মুখ ধুয়ে আয় ভাত খাই।'

আমি উঠলাম। শান্ত গলায় বললাম, ভাত খেয়েই আমি একটু বেরুব খালা।

'বের হতে চাইলে বের হবি। আমি কি তোকে আটকে রেখেছি না-কি? বাবুর্চি বলছিল তালা দিয়ে যাওয়ায় তুই নাকি অস্থির হয়ে পড়েছিলি। আশ্চর্য। তুই কি ছেলেমানুষ না-কি? তুই আবার তাকে বলেছিস তেলাপোকার স্যুপ খেতে চাস। হি হি হি। বাবুর্চিটা বোকা টাইপের, ও সত্যি ভেবে বসে আছে। ঠাট্টা বুঝতে পারেনি।'

'তেলাপোকার স্যুপ তৈরি করেছে? আমি ঠাট্টা করিনি। আসলেই খেতে চেয়েছিলাম।।'

'তুই দেখি আচ্ছা পাগল। আয় খেতে আয়। খেতে খেতে আমার ভয়ংকর গল্পটা বলব। তুই আবার চারদিকে বলে বেড়াবি না।'

ডাইনিং রুম ছাড়াও ছোট্ট একটা খাবার জায়গা আছে। শ্বেত পাথরের টেবিলে দু'টা মাত্র চেয়ার। মোমবাতি জ্বালিয়ে ক্যান্ডেল লাইট ডিনার। টেবিলে নানান ধরনের পদ

সাজানো।

বাবুর্চি পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। খালা বললেন, 'তুমি চলে যাও, তোমাকে আর লাগবে না। খাওয়া শেষ হলে ঘণ্টা বাজাব তখন সব পরিস্কার করবে।'

'ঘণ্টার ব্যবস্থাও আছে?'

'আছে, সব ব্যবস্থাই আছে। খাওয়া শুরু কর। বাবুর্চির রান্না কেমন বলবি। রান্না পছন্দ না হলে ব্যাটাকে বিদেয় করে দেব। ব্যাটার চোখের চাউনি ভাল না। স্যুপটা কেমন?'

'ভাল। খুব ভাল।'

'তুই তো এখনো মুখেই দিস নি। মুখে না নিয়েই বলে ফেললি ভাল?'

'গন্ধে গন্ধে বলে ফেলেছি। চায়নীজ খাবারের আসল স্বাদ গন্ধে। গন্ধ ঠিক আছে। বাবুর্চিকে রেখে দাও।'

'চোখের চাউনিটা যে খারাপ। মাঝে মাঝে ভয়ংকর করে তাকায়।'

'ওকে বলবে সব সময় যেন সানগ্লাস পরে থাকে।'

'বুদ্ধিটা খারাপ না। ভাল বলেছিস হিমু। এটা আমার মাথায় আসেনি। কথায় আছে না এক মাথার থেকে দু'মাথা ভাল — আসলেই তাই। এখন আমার সমস্যাটা শোন। খুব মন দিয়ে শুনবি।'

'খাওয়া শেষ হোক তারপর শুনি . . . '

'খেতে খেতেই শোন। আমি আবার চুপচাপ খেতে পারি না। ব্যাপারটা কি হয়েছে শোন। তোর খালু মারা যাবার পর বাড়ি ভর্তি হয়ে গেল ফালতু লোকে। অমুক আত্মীয় তমুক আত্মীয়। একেবারে খুঁটি গেড়ে বসেছে। মতলব আর কিছু না — টাকা পয়সা হাতানো। টাটকা মধু পড়ে আছে — পিঁপড়ার দল চারদিক থেকে এসে পড়েছে। আমি একে একে ঝেঁটিয়ে সব বিদেয় করলাম। বাড়ি খালি করে ফেললাম। চব্বিশঘণ্টা গেটে তালার ব্যবস্থা করলাম। একজনের জায়গায় দু'জন দারোয়ান রাখলাম। চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি। কাউকে ঢুকতে দেবে না। কেউ যদি ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি নট। আমার যদি কারোর সঙ্গে কথা বলার দরকার হয় আমি নিজেই দেখা করতে যাব। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। লোকজন টেলিফোনে বিরক্ত করে। দিলাম টেলিফোন লাইন কেটে।

এত বড় বাড়িতে আমি থাকি একা। একটু যে ভয় ভয় লাগে না, তা না। লাগে কিন্তু আত্মীয় স্বজনের যন্ত্রণার চেয়ে ভয় পাওয়া ভাল। লক্ষ গুণ ভাল।

তারপর একদিন কি হয়েছে শোন। রাত এগারোটার মত বাজে। খুব দেখি মশা কামড়াচ্ছে। দরজায়, জানালায় নেট আছে তারপরেও এত মশা ঢুকল কি ভাবে? আমার মেজাজ হয়েছে খারাপ। কারণ আমি আবার মশারির ভেতর ঘুমুতে পারি না। আমার একটা কাজের মেয়ে ছিল রেবা। ওকে বললাম মশারি খাটিয়ে দিতে। ও মশারি খাটিয়ে দিল। মেজাজ টেজাজ খারাপ করে ঘুমুতে গেছি। বাতি নিভিয়ে মশারির কাছে

গেলাম, মশারি তুলে দেখি মশারীর ভিতর ও বসে আছে। তোর খালু। নেংটো হয়ে বসে আছে। গুটিসুটি মেরে বসা। মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

আমি চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান। সেই থেকে শুরু। কখনো তাকে দেখি খাটের নিচে। কখনো বাথরুমের বাথটাবে। একদিন পেলাম ডীপ ফ্রীজে।

'কোথায়, ডীপ ফ্রীজে?'

'হ্যাঁ। ডীপ ফ্রীজ সব সময় বাবুর্চি খোলে। সেদিন ফ্রীজে জিনিসপত্র কি আছে দেখার জন্যে ডালাটা তুললাম — দেখি একেবারে খালি ফ্রীজ, সেখানে ও বসে ঠাণ্ডায় থরথর করে কাঁপছে। এই হল ব্যাপার, বুঝলি। এরপর থেকে রাতে ঘুমুতে পারি না।'

'রোজই দেখ?'

'প্রায় রোজই দেখি।'

'আজ দেখেছ?'

'এখনো দেখিনি। তবে দেখব তো বটেই। এর মানেটা কি বল তো হিমু? এই অত্যাচারের কারণ কি? ভুত প্রেত বলে সত্যি কিছু আছে? মানুষ মরলে ভূত হয়?'

আমি দেখলাম রেশমা খালা আর কিছু খেতে পারছেন না। মুখ শুকিয়ে গেছে। হাত কাঁপছে। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, হিমু কথা বলছিস না কেন?

'তুমি একাই উনাকে দেখ না আরো অনেকেই দেখে?'

'সবাই দেখে। রেবা দেখেছে। দেখে চাকরি-টাকরি ছেড়ে চলে গেছে। আমার সাথে যারা আছে তারাও দেখেছে। এরা কেউ রাতে দোতলায় ওঠে না। তুই রাতটা আমার সঙ্গে থাক। তুইও দেখবি।'

আমি খালার দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই প্রথম বেচারীর জন্যে মায়া লাগছে।



রেশমা খালার 'প্যালেসে' এক সপ্তাহ পার করে দিলাম। সমস্যামুক্ত জীবন যাপন। আহার, বাসস্থান নামক দু'টি প্রধান মৌলিক দাবি মিটে গেছে। এই দু'টি দাবি মিটলেই বিনোদনের দাবি ওঠে। খালার এখানে বিনোদনের ব্যবস্থাও প্রচুর আছে। আমার ভালই লাগছে।

ট্রাক দেখলে লোকে রাস্তা ছেড়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু সেই খোলা ট্রাকে করে ভ্রমণের আনন্দ অন্য রকম। আমার অবস্থা হয়েছে এরকমই। রেশমা খালার সঙ্গে গল্পগুজব করতে এখন ভালই লাগে। শুধু রাতে একটু সমস্যা হয়। রেশমা খালা আমার দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বলেন, আয় আয়, দেখে যা, নিজের চোখে দেখে যা। বসে আছে, খাটে পা দুলিয়ে বসে আছে।

আমি হাই তুলতে তুলতে বলি, থাকুক বসে। তুমিও তার পাশে বসে পা নাচাতে থাকো। এ ছাড়া আর করার কি আছে?

পুরোপুরি নিশ্চিন্ত, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন সম্ভব না। সব জীবনেই কিছু ঝামেলা থাকবে। কাবাব যতই ভালই হোক, কাবাবের এক কোনায় ছোট হাড্ডির টুকরো থাকবেই।

রাতে রেশমা খালার হৈ-চৈ, ছোটাছুটি, চিৎকার অগ্রাহ্য করতে পারলে গনি প্যালেসে মাসের পর মাস থাকা যায়। তাছাড়া ঐ বাড়ির বাবুর্চির সঙ্গে আমার বেশ সখ্য হয়েছে। নাপিত সম্প্রদায়ের মানুষ খুব বুদ্ধিমান হয় বলে জনশ্রুতি -- আমাদের বাবুর্চি সব নাপিতের কান কেটে নেয়ার বুদ্ধি রাখে। বোকার ভান করে সে দিব্যি আছে।

এক সকালে সে আমার জন্যে বিরাট এক বাটি স্যুপ বানিয়ে এনে বলল, আপনি একবার আরশোলার স্যুপ চেয়েছিলেন, বানাতে পারিনি। আজ বানিয়েছি। খেয়ে দেখুন স্যার, আপনার পছন্দ হবে। সঙ্গে মাশরুম আর ব্রকোলি দিয়েছি।

বাটির ঢাকনা খুলে আমার নাড়িভুড়ি পাক দিয়ে উঠলো। সাদা রঙের স্যুপ, তিন-চারটা তেলাপোকা ভাসছে। একটা আবার উল্টো হয়ে আছে। তার কিলবিলে পা দেখা যাচ্ছে।

বাবুর্চি শান্ত স্বরে বলল, সস-টস কিছু লাগবে স্যার?

আমি বললাম, কিছুই লাগবে না। তাকে পুরোপুরি হতভম্ব করে এক চামচ মুখে

দিয়ে বললাম, স্যুপটা মন্দ হয়নি। তবে আরশোলার পরিমাণ কম হয়েছে।

আমি কোন চীজ সে ধরতে পারেনি। ধরতে পারলে আমার সঙ্গে রসিকতা করতে যেত না। আমি তাকে সামনে দাঁড়া করিয়েই পুরো বাটি স্যুপ খেয়ে বললাম — বেশ ভাল হয়েছে। পরেরবার আরশোলার পরিমাণ বাড়াতে হবে। এটা যেন মনে থাকে।

বাবুর্চি বিড় বিড় করে বলল, জ্বি আচ্ছা, স্যার।

রেশমা খালা আমার প্রতি যথেষ্ট মমতা প্রদর্শন করছেন। সেই মমতার নিদর্শন হচ্ছে আমাকে বলেছেন ও হিমু, তোর তো ভিক্ষুকের মত হাঁটাহাঁটির স্বভাব। হাঁটাহাঁটি না করলে পেটের ভাত হজম হয় না। এখন থেকে গাড়ি নিয়ে হাঁটাহাঁটি করবি।

আমি বললাম, সেটা কি রকম?

'পাজেরো নিয়ে বের হবি। যেখানে যেখানে হাঁটতে ইচ্ছা করবে ড্রাইভারকে বলবি, গাড়ি নিয়ে যাবে।'

'এটা মন্দ না। গাড়িতে চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল।'

কিছুদিন থেকে আমি পাজেরো নিয়ে হাঁটছি। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছি, এই গাড়িতে বসলেই ছোট ছোট গাড়ি বা রিকশাকে চাপা দেয়ার প্রবল ইচ্ছা হয়। ট্রাক ড্রাইভার কেন অকারণে টেম্পো বা বেবীটেক্সির উপর ট্রাক তুলে দেয় আগে কখনো বুঝিনি। এখন বুঝতে পারছি। এখন মনে হচ্ছে দোষটা সর্বাংশে ট্রাক ড্রাইভারদের নয়, দোষটা ট্রাকের।

যে বড় সে ছোটকে পিষে ফেলতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক জাগতিক নিয়ম। ডারউইন সাহেবের ধারণা 'সারভাইভেল ফর দি ফিটেস্ট' শুধু জীবজগতের জন্যে প্রযোজ্য হবে, বস্তুজগতের জন্যে প্রযোজ্য হবে না, তা হয় না।

পাজেরো নিয়ে হাঁটতে বেরুবার একটাই সমস্যা — গলিপথে হাঁটা যায় না। রাজপথে হাঁটতে হয়। এরকম রাজপথে হাঁটতে বের হয়েই একদিন ইরার সঙ্গে দেখা। সে বেশ হাত নেড়ে গল্প করতে করতে একটা ছেলের সঙ্গে যাচ্ছে। দূর থেকে দু'জনকে প্রেমিক-প্রেমিকার মত লাগছে। ছেলেটা সুদর্শন। লম্বা, ফর্সা, কোকড়ানো চুল। কফি কালারের সার্টে সুন্দর মানিয়েছে। তার চেহারায় আলগা গাম্ভীর্য। সুন্দরী মেয়ে সঙ্গে নিয়ে হাঁটলেই আপনাআপনি ছেলেদের চেহারায় কিছু গাম্ভীর্য চলে আসে। তার একটু বেশি এসেছে।

আমি পাজেরো ড্রাইভারকে বললাম, ঐ যে ছেলেমেয়ে দু'টি যাচ্ছে, ঠিক ওদের পেছনে গিয়ে বিকট হর্ন দিন। যেন দু'জন ছিটকে দু'দিকে পড়ে যায়।

ড্রাইভার বিরক্ত হয়ে বলল, তারা যাচ্ছে ফুটপাতে। ফুটপাতে গাড়ি নিয়ে উঠব কিভাবে?

'তাহলে তাদের সাইডে নিয়ে গিয়েই হর্ন দিন। চেষ্টা করবেন হর্নটা যথাসম্ভব বিকট করার জন্যে।'

তাই করা হল। হর্ন শুনে ছেলেটার হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেট পড়ে গেল। ইরা ছেলেটার মত চমকালো না। মেয়েদের স্নায়ু ছেলেদের চেয়ে শক্ত হয়। আমি গলা বাড়িয়ে বললাম, এই ইরা, এই? যাচ্ছ কোথায়?

ইরা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। সঙ্গী ছেলেটা হতভম্ব।

আমি প্রায় অভিমানের মত গলায় বললাম, ঐ যে তুমি মেসে এসে একবার গল্পগুজব করে গেলে, তারপর তোমার আর কোন খোঁজ নেই। ব্যাপার কি বল তো? আমি এমন কি অন্যায় করেছি?

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি ছেলেটার চোখ-মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে। তার প্রেমিকা অন্য একজনের মেসে গল্প করে সময় কাটাচ্ছে এটা সহ্য করা মুশকিল। কোন প্রেমিকই করে না।

আমি হাসি হাসি মুখে বললাম, উঠে এসো ইরা। উঠে এসো। তোমার সঙ্গে এক লক্ষ কথা আছে। আজ সারাদিন গাড়ি করে ঘুরব আর গল্প করব।

ইরা কঠিন মুখ করে এগিয়ে এল। গাড়ির জানালার কাছে এসে চাপা গলায় বলল, আপনি এইভাবে কথা বলছেন কেন?

'কোনভাবে বলছি?'

'এমনভাবে বলছেন যেন আপনি আমার দীর্ঘ দিনের পরিচিত। ব্যাপার সে রকম নয়। মুহিব না জানি কি ভাবছে।'

'মুহিবটা কে? ঐ ক্যাবলা?'

'ক্যাবলা বলবেন না, কোনদিন না। কখনো না।'

'তোমার ক্লোজ ফ্রেন্ড?'

'হ্যাঁ।'

'তার ফ্রেন্ডশীপ কতটা গাঢ় সেটা আজ আমরা একটু পরীক্ষা করি। তুমি এক কাজ কর — মুহিবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গাড়িতে উঠে এসো। ওর প্রেমের দৌড়টা পরীক্ষা করা যাক। সে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকবে, রাগে থরথর করে কাঁপবে। সেটা দেখতে ইন্টারেস্টিং হবে।'

'সবার সঙ্গেই আপনি এক ধরনের খেলা খেলেন। আমার সঙ্গে খেলবেন না। এবং আপনি আমাকে আবার তুমি করে বলছেন। এ রকম কথা ছিল না।'

'আপনি তাহলে গাড়িতে উঠবেন না?'

'অবশ্যই না। আপনি আমাকে কি ভেবেছেন? পাপেট? সূতা দিয়ে বাঁধা পাপেট?'

'গাড়িতে না উঠলে চলে যাই। শুধু শুধু সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। তা ছাড়া মুহিব ছেলেটি কেমন ক্যাবলার মত হা করে আছে। দেখতে খারাপ লাগছে। আপনি বরং ওর কাছে চলে যান। ওকে বলুন হা করে তাকিয়ে না থাকতে। মুখে মাছি ঢুকে যেতে পারে।'

'এ রকম অশালীন ভঙ্গিতেও আর কোন দিন কথা বলবেন না।'

'আর কোনদিন আপনার সঙ্গে দেখাই হবে না। কথা বলার তো প্রশ্ন আসছে না।'

'দেখা হবে না মানে কি?'

'দেখা হবে না মানে, দেখা হবে না। মাসখানিকের জন্যে আমি অজ্ঞাতবাসে যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'হয় টেকনাফে, নয় তেতুলিয়ায়।'

'বাদলদের বাড়িতে আপনাকে যেতে বলেছিলাম, আপনি যাননি। ঐ বাড়িতে আপনাকে ভয়ংকর দরকার।'

'দরকার হলেও কিছু করার নেই। আচ্ছা ইরা, আমি বিদেয় হচ্ছি — তুমি কৃষ্ণের কাছে ফিরে যাও।'

ইরা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, আপনি এখন চলে গেলে আর আপনার দেখা পাব না। বাদলের আপনাকে ভয়ংকর দরকার।

'তাহলে দেরি করে লাভ নেই, উঠে এসো।'

'এই গাড়িটা কার?'

'কার আবার? আমার। তুমি দেরি করছ ইরা।'

'আপনি আসলে চেষ্টা করছেন মুহিবের কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে। কেন বলুন তো?'

'ঈর্ষা।'

'ঈর্ষা মানে? আপনি কি আমার প্রেমে পড়েছেন যে ঈর্ষা?'

মুহিব আরেকটা সিগারেট ধরিয়েছে। তার মুখে বিরক্তির গাঢ় রেখা। সে কর্কশ গলায় ডাকল — ইরা, শুনে যাও।

আমি বললাম, যাও, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি বেজে উঠেছে।

ইরা দোটানায় পড়ে গেলো। আমি ড্রাইভারকে বললাম, চল, যাওয়া যাক।

ড্রাইভার হুস করে বের হয়ে গেলো। যতটা স্পীডে তার বের হওয়া উচিত তারচেয়েও বেশি স্পীডে বের হল। মনে হচ্ছে সেও খানিকটা অপমানিত বোধ করছে। পাজেরোর মত বিশাল গাড়ি অগ্রাহ্য করার দুঃসাহসকে সেই গাড়ির ড্রাইভার ক্ষমা করে দেবে, তা হয় না।

'এখন কোন দিকে যামু স্যার?'

'দিক টিক না — চলতে থাক।'

দুপুরের দিকে আমি আমার পুরানো মেসে গেলাম। বদরুল সাহেবের খোঁজ নেয়া দরকার। চাকরির কিছু হয়েছে কি-না। হবার কোন সম্ভাবনা আমি দেখছি না, তবে বদরুল সাহেবের বিশ্বাস থেকে মনে হচ্ছে, হয়ে যেতেও পারে। মানুষের সবচে' বড় শক্তি তার বিশ্বাস।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর বদরুল সাহেব দরজা খুললেন। তাঁর হাসি-খুশি ভাব

আর নেই। চোখ বসে গেছে। এই দু'দিনেই মনে হয় শরীর ভেঙে পড়েছে। তাঁর গোলগাল মুখ কেমন লম্বাটে দেখাচ্ছে।

'বদরুল সাহেবের খবর কি?'

'খবর বেশি ভাল না, হিমু ভাই।'

'কেন বলুন তো?'

'আমার স্ত্রীর শরীরটা খুব খারাপ। ছোট মেয়ের চিঠি গত পরশু পেয়েছি। চিঠি পাওয়ার পর থেকে খেতেও পারছি না, ঘুমুতেও পারছি না।'

'ঢাকায় পড়ে আছেন কেন? আপনার চলে যাওয়া উচিত না?'

'ইয়াকুব আগামীকাল বিকেলে দেখা করতে বলেছে, এই জন্যেই যেতে পারছি না।'

'শেষ পর্যন্ত তাহলে আপনাকে চাকরি দিচ্ছে?'

'জ্বি। চাকরিটাও তো খুব বেশি দরকার। চাকরি না পেলে সবাই না খেয়ে মরব। আমি খুবই গরিব মানুষ, হিমু ভাই। কত শখ ছিল স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে একসঙ্গে থাকব। অর্থের অভাবে সম্ভব হয় নাই। একবার মালীবাগে একটা বাসা প্রায় ভাড়া করে ফেলেছিলাম। দুই রুমের একটা ফ্ল্যাট। বারান্দা আছে। রান্নার একটা জায়গা আছে। সামনে বড় আমগাছ। ডালে দোলনা বাঁধা। এত পছন্দ হয়েছিল! ভেবেছিলাম কষ্ট করে কোনমতে থাকব। এরা ছয় মাসের ভাড়া এ্যাডভান্স চাইল। কোথায় পাব ছয় মাসের এ্যাডভান্স, বলুন দেখি!'

'তা তো বটেই।'

'হিমু ভাই, ছোট মেয়ের চিঠিটা একটু পড়ে দেখেন।'

মাত্র ক্লাস সিক্সে পড়ে। কিন্তু ভাই চিঠি পড়লে মনে হয় না। মনে হয় কলেজে পড়া মেয়ের চিঠি। দু'টা বানান অবশ্য ভুল করেছে।

চিঠি পড়লাম।

আমার অতি প্রিয় বাবা,

বাবা, মা'র খুব অসুখ করেছে। প্রথমে বাসায় ছিল, তারপর পাশের বাড়ির মজনু ভাইয়া মা'কে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। ডাক্তাররা বলছে ঢাকা নিয়ে যেতে। বাসায় সবাই কান্নাকাটি করছে।

তুমি কোন টাকা পাঠাও নাই কেন বাবা? মা প্রথম ভেবেছিল পোস্টাপিসে টাকা আসেনি। রোজ পোস্টাপিসে খোঁজ নিতে যায়। তারপর মা কোত্থেকে যেন শুনল তোমার চাকরি চলে গেছে।

বাবা, সত্যি কি তোমার চাকরি চলে গেছে? সবার চাকরি থাকে, তোমারটা চলে গেলো কেন? তোমার চাকরি চলে যাবার খবর শুনে মা বেশি কান্নাকাটি করেনি, কিন্তু বড় আপা এমন কান্না কেঁদেছে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না। বড় আপা কাঁদে আর বলে — "আমার এত ভাল বাবা! আমার এত ভাল বাবা!" আমি বেশি কাঁদিনি, কারণ আমি জানি, তুমি খুব একটা ভাল চাকরি পাবে। কারণ আমি নামাজ পড়ে দোয়া করেছি। বাবা, আমি নামাজ পড়া শিখছি। ছোট আপা বলেছে আত্তাহিয়াতু ছাড়া নামাজ হয় না। ঐ দোয়াটা এখনো মুখস্থ হয় নাই। এখন মুখস্থ করছি। মুখস্থ হলে আবার তোমার চাকরির জন্যে দোয়া করব।

বাবা, মা'র শরীর খুব খারাপ। এত খারাপ যে তুমি যদি মা'কে দেখ চিনতে পারবে না। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো বাবা।

ইতি তোমার অতি আদরের ছোট মেয়ে
জাহেদা বেগম
ক্লাস সিক্স
রোল নং ১

'চিঠি পড়েছেন হিমু ভাই?'

'জ্বি।'

'মেয়েটা পাগলী আছে। চিঠির শেষে সব সময় কোন ক্লাস, রোল নং কত লিখে দেয়। ফার্স্ট হয় তো, এই জন্য বোধহয় লিখতে ভাল লাগে।'

'ভাল লাগারই কথা।'

'দু'টা বানান ভুল করেছে লক্ষ্য করেছেন? খোঁজ আর মুখস্থ। মুখস্থ দীর্ঘ উকার দিয়ে লিখেছে। কাছে থাকি না, কাছে থাকলে যত্ন করে পড়াতাম। সন্ধ্যাবেলা নিজের ছেলেমেয়েদের পড়াতে বসার আনন্দের কি কোন তুলনা আছে? তুলনা নেই। সবই কপাল।'

বদরুল সাহেবের চোখে পানি এসে গেছে। তিনি চোখের পানি মুছছেন। যতই মুছছেন ততই তাঁর চোখে পানি আসছে।

'বদরুল সাহেব!'

'জ্বি, হিমু ভাই।'

'আগামীকাল পাঁচটার সময় আপনার ইয়াকুব সাহেবের কাছে যাবার কথা না?'

'জ্বি।'

'আমি ঠিক চারটা চল্লিশ মিনিটে এসে আপনাকে নিয়ে যাব। আমিও যাব আপনার সঙ্গে। আপনার বন্ধু আবার আমাকে দেখে রাগ করবে না তো?'

'জ্বি না, রাগ করবে না। রাগ করার কি আছে! সে যেমন আমার বন্ধু, আপনিও সে রকম আমার বন্ধু। আপনি সঙ্গে থাকলে ভাল লাগবে। চাকরির সংবাদ একসঙ্গে পাব। দুঃখ ভাগাভাগি করতে ভাল লাগে না ভাই সাহেব, কিন্তু আনন্দ ভাগাভাগি করতে ভাল লাগে।'

'ঠিক বলেছেন। দুপুরে কিছু খেয়েছেন?'

'জ্বি না।'

'আসুন, ভাত খেয়ে আসি।'

'কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না, হিমু ভাই। এম্নিতেই মেয়ের চিঠি পড়ে মনটা খারাপ, তার উপরে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে — মনটা ভেঙে গেছে।'

'কি ঘটনা?'

'বলতে লজ্জা পাচ্ছি, হিমু ভাই।'

'লজ্জা পেলে বলার দরকার নেই।'

'না, আপনার কাছে কোন লজ্জা নেই। আপনি শুনুন — ফার্মগেটে গিয়েছি — হঠাৎ দেখি রশীদ। আবদুর রশীদ। নগ্ন। শুধু কোমরে একটা গামছা। এর-তার কাছে যাচ্ছে আর বলছে — একটা লুঙ্গি কিনে দিতে।'

'আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'জ্বি না। ও যেন আমাকে দেখতে না পায় এই জন্যে পালিয়ে চলে এসেছি। তারপর নিজের একটা লুঙ্গি, একটা শার্ট নিয়ে আবার গেলাম। তাকে পাইনি। মানুষের কি অবস্থা দেখেছেন হিমু ভাই?'

'জ্বি দেখলাম।'

'ইয়াকুবের কাছে ওর চাকরির কথা বলব বলে ভাবছি।'

'আগে নিজেরটা হোক তারপর বলবেন।'

'রশীদকে দেখে এত মনটা খারাপ হয়েছে।'

'আপনি তাহলে দুপুরে কিছু খাবেন না?'

'জ্বি না।'

'তাহলে আমি উঠি। আগামী কাল চাকরির খবরটা নিয়ে আমরা এক কাজ করব। সরাসরি আপনার দেশের বাড়িতে চলে যাব।'

'সত্যি যাবেন হিমু ভাই?'

'যাব।'

'আপনার ভাবীর শরীরটা খারাপ, আপনাকে যে চারটা ভাল-মন্দ রেঁধে খাওয়াবে সে উপায় নেই।'

'শরীর ঠিক করিয়ে ভাল-মন্দ রাঁধিয়ে খেয়ে তারপর আসব। ভাবী সবচে' ভাল রাঁধে কোন্ জিনিসটা বলুন তো?'

'গরুর গোশতের একটা রান্না সে জানে। অপূর্ব! মেথিবাটা দিয়ে রাঁধে। পুরো একদিন সিরকা-আদা-রসুনের রসে মাংস ডুবিয়ে রাখে, তারপর খুব অল্প আঁচে সারাদিন ধরে জ্বাল হয়। বাইরে থেকে এক ফোটা পানি দেয়া হয় না . . . কি যে অপূর্ব জিনিস ভাই সাহেব!'

'ঐ মেথির রান্নাটা ভাবীকে দিয়ে রাঁধাতে হবে।'

'অবশ্যই অবশ্যই। পোনা মাছ যদি পাওয়া যায় তাহলে আপনাকে এমন এক জিনিস খাওয়াবো, এই জীবনে ভুলবেন না। কচি সজনে পাতা বেটে পোনা মাছের সঙ্গে

রাঁধতে হয়। কোন মসলা না, কিছু না, দু'টা কাঁচামরিচ, এক কোয়া রসুন, একটু পেয়াজ। এই দেখুন বলতে বলতে জিবে পানি এসে গেলো।'

'জিবে পানি যখন এসে গেছে চলুন, খেয়ে আসি।'

'জ্বি আচ্ছা, চলুন। আপনি দেশে যাবেন ভাবতেই এত ভাল লাগছে!'

মেস থেকে বেরুবার মুখে ম্যানেজার হায়দার আলী খাঁ বললেন, স্যার, আপনি মেসে ছিলেন না, আপনার কাছে ঐ মেয়েটা দু'বার এসেছিল।

'ইরা?'

'জ্বী, ইরা। উনার বাসায় যেতে বলেছে। খুব দরকার।'

'জানি। আমার সঙ্গে ঐ মেয়ের দেখা হয়েছে। ঐ মেয়ে যদি আবার আসে , বলবেন Get lost.'

'স্যার, কি বলব?'

'বলবেন Get lost. কঠিন গলায় বলবেন।'

'জ্বি, আচ্ছা।'

হায়দার আলী খাঁ পিরিচে চা খাচ্ছিল। আবারো সারা শরীরে চা ফেলে দিল। এই মানুষটা আমাকে এত ভয় পায় কেন কে জানে!



রাতের অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি, দুঃশ্চিন্তা ও আতংক ভোরবেলা একটা 'হট শাওয়ার' দিয়ে রেশমা খালা দূর করে দেন। গোসলের পর তিনি পরচুলাটা মাথায় দেন। খানিকটা সাজগোজ করে আমার ঘরে এসে বললেন, কি রে হিমু, জেগেছিস? গুড মর্নিং।

আমিও বলি, গুড মর্নিং খালা।

'চা দিতে বলেছি। হাত-মুখ ধুয়ে আয়।'

'তোমাকে তো আজ দারুণ লাগছে। কপালে টিপ দিয়ে বয়স দশ বছর কমিয়ে ফেলেছ। এখন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার বয়স বাহান্ন।'

খালা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, আমার বয়স তো আসলেই বাহান্ন।

'ও সরি!'

'হিমু, তোর ঠাট্টা-ফাজলামি আমার ভাল লাগে না। সাজগোজ সামান্য করি — তাতে কি? দু'দিন পরে তো মরেই যাব। কবরে গিয়ে তো সাজতে পারব না। কবরে তোরা তো আর ক্রীম, লিপস্টিক দিয়ে আসবি না।'

'সেটা খাঁটি কথা।'

'বয়সকালে সাজতে পারিনি। এমন এক লোকের হাতে পড়েছিলাম যার কাছে সাজা না-সাজা এক। তাকে একবার ভাল একটা ক্রীম আনতে বলেছিলাম, সে দেশী তিব্বত ক্রিম নিয়ে চলে এসেছে। তারপরেও আফসোস — এত নাকি দাম।'

'এখন তো পুষিয়ে নিচ্ছ।'

'তা নিচ্ছি। আয়, চা খাবি। আজ ইংলিশ ব্রেকফাস্ট।'

'চমৎকার!'

চায়ের টেবিলে রেশমা খালাকে বললাম, খালা, অদ্য শেষ সকাল।

খালা বললেন, তার মানে কি?

'তার মানে হচ্ছে নাশতা খেয়েই আমি ফুটছি।'

'ফুটছি মানে কি?'

'ফুটছি মানে বিদেয় হচ্ছি। লম্বা লম্বা পা ফেলে পগারপার।'

'আশ্চর্য কথা! চলে যাবি কেন? এখানে কি তোর কোন অসুবিধা হচ্ছে?'

'কোনই অসুবিধা হচ্ছে না। বরং সুবিধা হচ্ছে। আমার ভুড়ি গজিয়ে গেছে। "মেদ-ভুড়ি কি করি"-ওয়ালাদের খুঁজে বের করতে হবে।'

'ঠাট্টা করবি না হিমু। খবর্দার, ঠাট্টা না।'

'আমি মোটেও ঠাট্টা করছি না খালা। চা খেয়েই আমি ফুটব।'

খালা বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, আমার এই ভয়ংকর অবস্থা দেখেও তোর দয়া হচ্ছে না? রাতে এক ফোঁটা ঘুমুতে পারি না। ঐ বদমায়েশ লোকটার যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরে যেতে ইচ্ছে করে। আর তুই চলে যাবি?

আমি অবাক হয়ে বললাম, খালু সাহেব কি কালও এসেছিল? গতকাল তো তার আসার কথা না।

'গতকাল তার আসার কথা না মানে? তুই জানলি কি করে তার আসার কথা না?'

'আমার সঙ্গে কথা হয়েছে।'

খালা হতভম্ব হয়ে বললেন, তোর সঙ্গে কথা হয়েছে?

'হুঁ।'

'হুঁ-হ্যাঁ করিস না, ঠিকমত বল। তুই দেখেছিস?'

'হুঁ।'

'আবার হুঁ? আরেকবার হুঁ বললে কেতলির সব চা মাথায় ঢেলে দেব। কখন দেখা হল?'

'কাল রাত ন'টার দিকে।'

'বলিস কি!'

'তুমি রাতে খাওয়ার জন্যে ডাকলে। আমি ঘর থেকে বেরুব। স্যান্ডেল খোঁজার জন্যে নিচু হয়ে দেখি, উনি ঘাপটি মেরে খাটের নিচে বসে আছেন।'

'তোর খাটের নিচে ও বসবে কিভাবে? তোর খাটটা হল বক্স খাট। বক্স খাটের আবার নিচ কি?'

'ঠিক নিচ না, বলতে ভুল করেছি। খাটের সাইডে।'

'গায়ে কাপড়-চোপড় ছিল?'

'উঁহুঁ।'

'তুই দেখে ভয় পেলি না?'

'ভয় পাব কেন? জীবিত অবস্থায় উনার সঙ্গে আমার ভাল খাতির ছিল। একবার হেঁটে হেঁটে সদরঘাটের দিকে যাচ্ছি। তিনি তাঁর প্রাইভেট রিকশায় যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে রিকশা থামিয়ে তুলে নিলেন। পথে এক জায়গায় আখের সরবত বিক্রি হচ্ছিল। রিকশা থামিয়ে আমরা আখের সরবত খেলাম। আরেকটু এগিয়ে দেখি ডাব বিক্রি করছে — রিকশা থামিয়ে দু'জন ডাব খেলাম। তারপর খালু সাহেব আইসক্রীম কিনলেন। খেতে খেতে আমরা তিনজন যাচ্ছিলাম।'

'তিনজন হল কিভাবে?'

'রিকশাওয়ালাও খাচ্ছিল। তিনজন মিলে রীতিমত এক উৎসব। বুঝলে খালা, তখনই বুঝলাম উনি একজন অসাধারণ মানুষ। প্রায় মহাপুরুষ পর্যায়ের। ব্যবসায়ীরাও মহাপুরুষ হতে পারে কোনদিন ভাবিনি।'

'তুই এক কথা থেকে আরেক কথায় চলে যাচ্ছিস। আসল কথা বল। খাটের নিচে ও বসেছিল?'

'খাটের নিচে না, সাইডে।'

'তারপর?'

'আমি বললাম, খালু সাহেব, কেমন আছেন?'

'সে কি বলল?'

'কিছু বললেন না। মনে হল লজ্জা পেলেন। তখন আমি বেশ রাগ রাগ ভাব নিয়ে বললাম — আপনার মত একটা ভদ্রলোক . . . মেয়েছেলেকে ভয় দেখাচ্ছেন। এটা কি ঠিক হচ্ছে? ভয় দেখানোর মধ্যেও তো শালীনতা, ভদ্রতা আছে। নেংটো হয়ে ভয় দেখানো। তাও নিজের স্ত্রীকে! ছিঃ ছিঃ!'

'তুই কি সত্যি এইসব বলেছিস?'

'হ্যাঁ বললাম। উনি আমার কথায় লজ্জা পেলেন খুব। মাথা নিচু করে ফেললেন। আমার তখন মনটা একটু খারাপ হল। আমি বললাম, এসব করছেন কেন?'

'সে কি বলল?'

'কথাবার্তা তাঁর খুব পরিষ্কার না। অস্পষ্ট। কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা যায় না। তবু যা বুঝেছি, উনি বললেন — তোর খালাকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে এইসব করছি। শিক্ষা হয়ে গেলে আর করব না।'

রেশমা খালা ফস করে বললেন, শিক্ষা? কিসের শিক্ষা? আমি কি করেছি যে সে আমাকে শিক্ষা দেবে? সারাজীবন যন্ত্রণা করেছে। মরার পরেও যন্ত্রণা দিচ্ছে। আর কিছু না। লোকটা ছিল হাড় বদমাশ।

আমিও খালু সাহেবকে এই কথাই বললাম। শুধু বদমাশটা বললাম না। তখন খালু সাহেব বললেন, তুমি আসল ঘটনা জান না। তোমার খালা আমাকে বিষ খাইয়েছিল।

'এত বড় মিথ্যা কথা আমার নামে? এত সাহস? ব্যথায় তখন ওর দম যায়-যায় অবস্থা। আমার মাথার নেই ঠিক — দৌড়ে অষুধ নিয়ে এনে খাওয়ালাম . . .'

খালু বললেন, যেটা খাওয়ানোর কথা সেটা না খাইয়ে ভুলটা খাইয়েছে। পিঠে মালিশের অষুধ দু'চামচ খাইয়ে দিয়েছে।

'ইচ্ছা করে তো খাওয়াইনি। ভয়ে আমার মাথা এলোমেলো।'

'আমিও খালু সাহেবকে তাই বললাম। আমি বললাম — এটা অনিচ্ছাকৃত একটা ভুল। রেশমা খালা মানুষ খুন করার মত মহিলাই না। অতি দয়ার্দ্র মহিলা।'

'এটা শুনে কি বলল?'

'খিক খিক করে অনেকক্ষণ হাসল। তারপর আমি বললাম, এখনো তোমার প্রতি

খালার গভীর ভালবাসা। তোমার স্মৃতি রক্ষার্থে "গনি মিয়া ইন্সটিটিউট অব মডার্ন আর্ট" করবে।'

'শুনে কি বলল?'

'শুনে বলল, এইসব যদি করে তাহলে লাথি মেরে মাগীর কোমর ভেঙে ফেলব। ভূত হবার পর খালু সাহেবের ভাষার খুবই অবনতি হয়েছে। স্ত্রীকে মাগী বলা জীবিত অবস্থায় উনার জন্যে অকল্পনীয় ছিল।'

রেশমা খালা এখন আর চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন না। স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন। চোখের দৃষ্টি আগের মত না — অন্যরকম। 'আমি খালু সাহেবকে বললাম, যা হবার হয়েছে। মাফ করে দেন। ক্ষমা যেমন মানবধর্ম, তেমনি ক্ষমা হচ্ছে ভূতধর্ম। উনি এক শর্তে ক্ষমা করতে রাজি হয়েছেন।'

'শর্তটা কি?'

'শর্তটা হচ্ছে — তুমি তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দান-খয়রাত করবে। স্কুল-কলেজে দিবে, এতিমখানা করবে, তাঁর দরিদ্র সব আত্মীয়স্বজনদের সাহায্য করবে। তাহলেই তিনি আর তোমাকে বিরক্ত করবেন না।'

'হিমু!'

'জ্বি খালা।'

'তুই অসম্ভব বুদ্ধিমান। তুই কিছুই দেখিসনি। কারো সঙ্গেই তোর কথা হয়নি। পুরোটা আমাকে বানিয়ে বানিয়ে বলেছিস। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছিলি — ঢিল লেগে গেছে। তোর খালু যেমন বোকা ছিল, আমিও ছিলাম বোকা। শুধু ছিলাম না — এখনো আছি। কথা দিয়ে তুই আমাকে প্যাঁচে ফেলেছিস। তোর ধারণা তোর কথা শুনে তার কোটি কোটি টাকা আমি দান-খয়রাত করে নষ্ট করব? রাতে ভূত হয়ে আমাকে ভয় দেখায়, তাতে কি হয়েছে? দেখাক যত ইচ্ছা। বদমায়েশের বদমায়েশ!'

'এখন রাতে ভয় দেখাচ্ছেন, তারপর দিনেও দেখাবেন। আমাকে সে রকমই হিন্টস দিলেন।'

'বেশি চালাকি করতে যাস না হিমু। তোর চালাকির আমি পরোয়া করি না। খবর্দার, তোকে যেন আর কোনদিন এই বাড়ির আশেপাশে না দেখি।'

'আর দেখবে না খালা। এই যে আমি ফুটব, জন্মের মতই ফুটব। খালা শোন, খালু সাহেবের সঙ্গে দীর্ঘ কথাবার্তার যে বর্ণনা আমি দিলাম তার পুরোটাই বানানো, তবে উনাকে আমি কিন্তু দেখেছি।'

'চুপ থাক হারামজাদা!'

'বিশ্বাস করুন উনাকে দেখেছি, এবং আপনি যে উনাকে মেরে ফেলেছেন এটা উনি ইশারায় আমাকে বোঝালেন। উনি কোন কথা বলেননি। ভূতদের সম্ভবত কথা বলার ক্ষমতা থাকে না।'

'চুপ হারামজাদা — শূওরের বাচ্চা। চুপ!'

রেশমা খালা ভয়ানক হৈ-চৈ শুরু করলেন। বাবুর্চি, দারোয়ান, মালী সবাই ছুটে এল। রেশমা খালা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, এই চোরটাকে লাথি মেরে বের করে দাও।

রেশমা খালার কর্মচারীরা ম্যাডামের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। শুধু লাথিটা দিল না। লাথির বদলে এমন গলাধাক্কা দিল যে রাস্তায় উল্টে পড়তে পড়তে কোনমতে রক্ষা পেলাম। খালার বাড়িতে আমার রেক্সিনের একটা ব্যাগ রয়ে গেল। ব্যাগের ভেতর আমার ইহজাগতিক যাবতীয় সম্পদ। দুটা শার্ট, একটা খুব ভাল কাশ্মিরী শাল। শালটা রূপা আমাকে জন্মদিনে দিয়েছিল। আমি হতদরিদ্র মানুষ হলেও বুকে হাত দিয়ে একটা কথা বলতে পারি — ঢাকা শহরে এমন দামী শাল আর কারোরই নেই।

গলাধাক্কার ভেতর যে দিন শুরু হয়েছে সেই দিনের শেষটা কেমন হবে ভাবতেই আতংক লাগে। বিকেলে বদরুল সাহেবকে নিয়ে ইয়াকুব নামক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের কাছে যাবার কথা। সেখানে কোন্ নাটক হবে কে জানে।

রূপার সঙ্গে আজ সকালের মধ্যেই আমার দেখা করা দরকার। একমাত্র সেই পারে একদিনের নোটিশে বদরুল সাহেবের জন্যে চাকরির ব্যবস্থা করতে। টেলিফোনে রূপার সঙ্গে কথা বলব — না সরাসরি তার বাড়িতে উপস্থিত হব, বুঝতে পারছি না। বাদলদের বাড়িতেও একবার যাওয়া দরকার। বাদল এমন কি করছে যে ইরাকে বার বার আমার খোঁজে যেতে হচ্ছে? রূপাকে বাদলদের বাসা থেকেও টেলিফোন করা যায়।

দরজা খুলে দিল ইরা। আমি অসম্ভব ভদ্র গলায় বললাম, কেমন আছেন?

ইরা কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। দিন শুরু হয়েছে গলাধাক্কায়, কাজেই যার সঙ্গেই দেখা হবে সেই কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকবে এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? আমাকে যে লাঠি দিয়ে মারছে না এই আমার তিনপুরুষের ভাগ্য।

'বাদল আছে না-কি?'

'আছে।'

'ফুপা-ফুপু আছেন?'

'সবাই আছেন। আপনি বসুন।'

ইরা কঠিন মুখে ভেতরে চলে গেল।

এমনভাবে গেল যেন বন্দুক আনতে গেছে। ফুপা অফিসে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, প্যান্ট পরেছেন, বোতাম লাগানো হয়নি, প্যান্টের বেল্ট লাগানো হয়নি। এই অবস্থাতেই চলে এলেন। আগুন আগুন চোখে তাকালেন। স্বামীর পেছনে পেছনে স্ত্রী — তাঁর চোখেও আগুন।

আমি হাসিমুখে বললাম, তারপর, খবর কি আপনাদের? সব ভাল?

ফুপা ক্রুদ্ধ গর্জন করলেন। গর্জন শুনেই মনে হচ্ছে খবর ভাল না।

'আপনাদের আর কারো গলায় কাঁটা-টাটা বিঁধেছে?'

ফুপা এবারে হুংকার দিলেন, ইয়ারকি করছিস? দাঁত বের করে ইয়ারকি?

আমার অপরাধ কি বুঝতে পারছি না। তবে গুরুতর কোন অপরাধ যে করে ফেলেছি তা বোঝা যাচ্ছে। ইরাও এসেছে। তার চোখে আগে চশমা দেখিনি, এখন দেখি চশমা পরা।

ফুপু বললেন, তোকে যে এতবার খবর দেয়া হচ্ছে আসার জন্যে গায়ে লাগছে না? তোকে কি হাতি পাঠিয়ে আনাতে হবে?

'এলাম তো।'

'এসে তো উদ্ধার করে ফেলেছিস।'

'ব্যাপারটা কি খোলাসা করে বলুন।'

কেউ কিছু বলছে না। ভাবটা এরকম — আমি বলব না। অন্য কেউ বলুক। আমি ইরার দিকে তাকিয়ে আদুরে গলায় বললাম, ইরা, চা খাব।

ইরা এমন ভাব করল যেন অত্যন্ত অপমানসূচক কোন কথা তাকে বলা হয়েছে।

আমি বললাম, তুমি যদি চা বানাতে না পার তাহলে লুৎফার মা'কে বল। ভাল কথা, লুৎফা মেয়েটা কোথায়?

এবারো জবাব নেই। ফুপা পেন্টের বোতাম লাগাচ্ছেন বলে অগ্নিদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে পারছেন না। তাঁকে বোতামের দিকে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে, তবে ফুপু তাঁর দৃষ্টি দিয়ে স্বামীর অভাব পূরণ করে দিচ্ছেন। তাঁর চোখে ডাবল আগুন। কথা বলল ইরা। কাটা কাটা ধরনের কথা। তার কাছ থেকেই জানা গেল লুৎফা মেয়েটা চোরের হদ্দ। এসেই চুরি শুরু করেছে। বিছানার তল থেকে টাকা নিচ্ছে, মানিব্যাগ খুলে নিচ্ছে, সবশেষে যা করেছে তা অবিশ্বাস্য। ফুপুর কানের দুল চুরি করে নিজের পায়জামার ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছে। লাফালাফি করছিল, হঠাৎ পায়জামার ভাঁজ থেকে দুল বের হয়ে এলো। তৎক্ষণাৎ মা-মেয়ে দু'জনকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে। কাজেই বাড়িতে এই মুহূর্তে কোন কাজের মেয়ে নেই। আগের মত চাইলেই চা পাওয়া যাবে না।

বাদলের প্রসঙ্গে যা জানা গেল তা কানের দুলের চেয়েও ভয়াবহ। সে গত দশদিন হল ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে না। দরজা বন্ধ করে ধ্যান করছে।

আমি মধুর ভঙ্গিতে ফুপার দিকে তাকিয়ে বললাম, ধ্যান করা তো গুরুতর অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না। আপনারা এত আপসেট কেন?

ফুপা বললেন, মুগুড় দিয়ে এমন বাড়ি দেব যে সব ক'টা দাঁত খুলে চলে আসবে। ধ্যান করা শেখায়। সাহস কতবড়! যা, ধ্যান কিভাবে করছে নিজের চোখে দেখে আয়।

'কিভাবে ধ্যান করছে?'

'কাপড়-জামা খুলে ধ্যান করছে। হারামজাদা! দশ দিন ধরে বিছানার উপর নেংটো হয়ে বসে আছে।'

'সে কি !'

'আবার বলে সে-কি? তুই-ই না-কি বলেছিস নেংটো হয়ে ধ্যান করতে হয়। ধ্যান করা কাকে বলে তোকে আমি শেখাব। বন্দুক দিয়ে আজ তোকে আমি গুলি করে মেরে ফেলব। গুরুদেব এসেছে — ধ্যান শেখায় !'

ফুপু বললেন, তুমি এত হৈ-চৈ করো না। তোমার প্রেসারের সমস্যা আছে। তুমি অফিসে চলে যাও। যা বলার আমি বলছি।

'অফিস চুলায় যাক। আমি হিমুকে সত্যি সত্যি গুলি করে মেরে তারপর অফিসে যাব। গুরুদেবগিরি বের করে দেব।'

ইরা বলল, হৈ-চৈ করে তো লাভ কিছু হবে না। ব্যাপারটা ভাল মীমাংসা হওয়া দরকার। উনি বাদলকে বুঝিয়ে বলবেন যেন সে এসব না করে। তারপর এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন। আর কখনো এ বাড়িতে আসবেন না। এবং বাদলের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ রাখবেন না।

ফুপা তীব্র গলায় বললেন, যোগাযোগ রাখবে কিভাবে? হারামজাদাকে আমি দেশছাড়া করবো না! এ ক্রিমিন্যাল! এ পেস্ট!

পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হতে আধ ঘণ্টার মত লাগল। এর মধ্যে ইরা চা বানিয়ে আনল। ফুপার অফিসের গাড়ি এসেছিল — তিনি আমাকে গুলি করা আপাতত স্থগিত রেখে অফিসে চলে গেলেন। ফুপু ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে বসলেন। ফোঁসফোসানির মাঝখানে যা বললেন তা হচ্ছে — এত বড় ধামড়া ছেলে নেংটা হয়ে বসে আছে! কি লজ্জার কথা! তাকে তার ঘরে খাবার দিয়ে আসতে হয়। ভাগ্যিস বেশি লোকজন জানে না। জানলে নির্ঘাৎ পাবনা মেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে আসতো।

ইরা আমার দিকে তাকিয়ে মোটামুটি শান্ত ভঙ্গিতেই বলল, আপনি চা খেয়ে দয়া করে বাদলের কাছে যান। তাকে বুঝিয়ে বলুন। সে বাস্তব এবং কল্পনা গুলিয়ে ফেলেছে।

আমি চায়ের কাপ হাতে বাদলের ঘরে গিয়ে টোকা দিলাম। বাদল আনন্দিত গলায় বলল, হিমু ভাই?

'হুঁ।'

'আমি টোকা শুনেই টের পেয়েছি। তুমি ছাড়া এরকম করে কেউ টোকা দেয় না।'

'তুই ধ্যান করছিস না-কি?'

'হুঁ। হচ্ছে না।'

'দরজা খোল দেখি।'

বাদল দরজা খুলল। সে যে নগ্ন হয়েই বসেছিল সেটা বোঝা যাচ্ছে। তার কোমরে তোয়ালে জড়ানো। মুখ আনন্দে ঝলমল করছে।

'তোমাকে দেখে এত আনন্দ হচ্ছে হিমু ভাই। মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলব।'

'তুই মনে হচ্ছে নাগা সন্ন্যাসীর পথ ধরে ফেলেছিস।'

'তুমি একবার বলেছিলে না — সব ত্যাগ করতে হবে। আসল জিনিস পেতে হলে সর্বত্যাগী হতে হবে। পোশাক-পরিচ্ছদও ত্যাগ করতে হবে।'

'বলেছিলাম না-কি?'

'হ্যাঁ বলেছিলে।'

'ঐ স্টেজে তো ঝপ করে যাওয়া যায় না। ধাপে ধাপে উঠতে হয়। ব্যাপারটা হল সিঁড়ির মত। লম্বা সিঁড়ি। সিঁড়ির একেকটা ধাপ পার হয়ে উঠতে হয়। ফস করে জামা-কাপড় খুলে নেংটা হওয়াটা কোন কাজের ব্যাপার না।'

'শার্ট-প্যান্ট পরে ফেলব?'

'অবশ্যই পরে ফেলবি। ইউনিভার্সিটি খোলা না?'

'হ্যাঁ।'

'আজ ক্লাস আছে?'

'আছে।'

'জামা-কাপড় পরে ক্লাসে যা। সাধনার প্রক্রিয়া শিখিয়ে দেব। আস্তে আস্তে উপরে উঠতে হবে। কাউকে কিছু বুঝতে দেয়া যাবে না। তুই নেংটা হয়ে বসে আছিস — আর এদিকে বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। এইভাবে সাধনা হয়?'

'ঠিকই বলেছ। ইউনিভার্সিটিতে যেতে বলছ?'

'অবশ্যই।'

'আমার ইউনিভার্সিটিতে যেতে একেবারেই ইচ্ছা করে না।'

'কি ইচ্ছা করে?'

'সারাক্ষণ ইচ্ছা করে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকি। তোমার সঙ্গে পথে পথে হাঁটি।'

'পাশাপাশি দু'ভাবে থাকা যায়। স্থূলভাবে থাকা যায়। এই যেমন তুই আর আমি এখন পাশাপাশি বসে আছি। আবার সূক্ষ্মভাবে — চেতনার ভেতরও থাকা যায়। তুই যেই ভাববি আমার সঙ্গে আছিস, অম্নি তুই আমার পাশে চলে এসেছিস। সাধারণ মানুষ স্থূল অর্থেই জীবনকে দেখে। এতেই তারা সন্তুষ্ট। তুই নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ হতে চাস না?'

'না।'

'ভেরী গুড। যা, ইউনিভার্সিটিতে চলে যা।'

'আচ্ছা যাচ্ছি। হিমু ভাই, তুমি কি আমার একটা রিকোয়েস্ট রাখবে? জাস্ট ওয়ান।'

'তোর একটা না, এক লক্ষ রিকোয়েস্ট রাখব। বলে ফেল।'

'ইরা মেয়েটাকে একটা শিক্ষা দেবে? কঠিন একটা শিক্ষা!'

'সে কি করেছে?'

'তোমাকে নিয়ে শুধু হাসাহাসি করে। রাগে আমার গা জ্বলে যায়!'

'সামান্য ব্যাপারে গা জ্বললে হবে কেন?'

'আমার কাছে সামান্য না। কেউ তোমাকে কিছু বললে অমার মাথা খারাপের মত হয়ে যায়। হিমু ভাই, তুমি ইরাকে একটা শিক্ষা দাও। ওকে শিক্ষা দিতেই হবে।'

'কি শিক্ষা দেব?'

'ওকেও তুমি হিমু বানিয়ে দাও। মহিলা হিমু, যেন সে হলুদ পাঞ্জাবি পরে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটে।'

'মেয়েমানুষ হয়ে রাত-বিরাতে রাস্তায় হাঁটবে! এটা ঠিক হবে না। তাছাড়া এমন একজন ভাল ছাত্রী!'

'বেশ, তাহলে তুমি তাকে এক রাতের জন্যে হিমু বানিয়ে দাও। জাস্ট ফর ওয়ান নাইট।'

'দেখি।'

'না, দেখাদেখি না। তোমাকে বানাতেই হবে। তুমি ইচ্ছা করলেই হবে।'

ফুপু এবং ইরার বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে বাদল কাপড়-চোপড় পরে ইউনিভার্সিটিতে চলে গেল।

ইরা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি যা করেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ। এখন দয়া করে এ বাড়িতে আর আসবেন না।

আমি বললাম, জ্বি আচ্ছা। শুধু একটা টেলিফোন করব। টেলিফোন করে জন্মের মত চলে যাব।

ইরা বলল, যদি সম্ভব হয় আপনি দয়া করে নিজেকে বদলাবার চেষ্টা করবেন। আপনাকে আমি কোন উপদেশ দিতে চাই না। অপাত্রে উপদেশ দেয়ার অভ্যাস আমার নেই। তার পরেও একটা কথা না বলে পারছি না —হলুদ পাঞ্জাবি পরে রাস্তায় হাঁটলেই প্রকৃতিকে জানা যায় না। প্রকৃতিকে জানার পথ হল বিজ্ঞান। বুঝতে পারছেন?

'পারছি।'

'পারলে ভাল। না পারলেও ক্ষতি নেই।'

ফুপু বললেন, ওর সঙ্গে কথা বলিস না ইরা। টেলিফোনটা এনে দে। টেলিফোন করে বিদেয় হোক।

ইরা টেলিফোন এনে দিল।

'হ্যালো রূপা! আমি হিমু।'

'বুঝতে পারছি।'

'কেমন আছ, রূপা?'

'আমি কেমন আছি সেটা জানার জন্যে তুমি আমাকে টেলিফোন করোনি। তোমার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। সেটা বলে ফেল।'

'রাগ করছ কেন?'

'রাগ করছি না। তোমার উপর রাগ করা অর্থহীন। যে রাগ বোঝে না তার উপর রাগ করে লাভ কি?'

'রাগ হচ্ছে মানব চরিত্রের অন্ধকার বিষয়ের একটি। রাগ না বোঝাটা তো ভাল।'

'যে অন্ধকার বোঝে না, সে আলোও ধরতে পারে না।'

'রূপা, তোমার লজিকের কাছে সারেন্ডার করছি।'

'কি জন্যে টেলিফোন করছ বল।'

'আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দাও রূপা। এমন একটা চাকরি যেন ভদ্রভাবে খেয়ে-পরে ঢাকা শহরে ছোটখাট একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকা যায়। জোগাড় করে দিতে পারবে?'

'এমন কি কখনো হয়েছে যে তুমি আমার কাছে কিছু চেয়েছ আর আমি বলেছি — না?'

'হয়নি।'

'এবারো হবে না।'

'আজ দিনের ভেতর চাকরিটা জোগাড় করে দিতে হবে।'

'সেটা কি করে সম্ভব?'

'তোমার জন্যে কোন কিছুই অসম্ভব না।'

'চাকরিটা কার জন্যে?'

'আমার এক বন্ধুর জন্যে। অতি প্রিয় একজনের জন্যে।'

'নাম বল। এপয়েন্টমেন্ট লেটারে তার নাম তো লাগবে।'

'লিখো — বদরুল আলম। চাকরিটা কিন্তু আজকের মধ্যেই জোগাড় করতে হবে।'

'চেষ্টা করব। এপয়েন্টমেন্ট লেটার কি তুমি এসে নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ, আমি এসে নিয়ে যাব।'

'তুমি কোত্থেকে টেলিফোন করছ? যদি বলতে তোমার কোন আপত্তি না থাকে।'

'আমি বাদলদের বাসা থেকে টেলিফোন করছি। এই নাম্বার তোমার কাছে আছে। এই নাম্বারে টেলিফোন করে আমাকে পাবে না। তারা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।'

'সবাই তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়?'

'হ্যাঁ দেয়। এই ভয়েই আমি তোমার কাছে যাই না। কাছে গেলে তুমিও হয়ত বের করে দেবে। রূপা, আমি টেলিফোন রাখি?'

'না, আরেকটু কথা বল। প্লীজ, প্লীজ।'

'কি বলব?'

'যা ইচ্ছা বল। এমন কিছু বল যেন . . .'

'যেন কি?'

'না, থাক।'

আমার আগেই রূপা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। আমি ফুপুর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ইরার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ইরা বলল, আপনাকে অনেক কঠিন কথা বলেছি — আপনি কিছু মনে করবেন না।

আমি বললাম, আমি কিছু মনে করিনি। আমি নানানভাবে আপনাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করেছি। আপনিও কিছু মনে করবেন না।

আমার ক্ষীণ আশা ছিল, মেয়েটা হয়ত বাড়ির গেট পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দেবে। সে এল না। আশ্চর্য কঠিন এক মেয়ে!

আমি এবং বদরুল সাহেব পাশাপাশি বসে আছি। ইয়াকুব আলি আমাদের সামনেই আছেন। আমাদের মাঝখানে বিরাট এক সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলে দু'টা টেলিফোন। একটা শাদা, একটা লাল। ইয়াকুব আলি সাহেব রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন। তিনি অসম্ভব ব্যস্ত। আমরা বসে থাকতে থাকতে তিন-চারটা টেলিফোন করলেন। তাঁর টেলিফোন করার ধরনটা বেশ মজার। স্থির হয়ে কথা বলতে পারেন না। রিভলভিং চেয়ারে পাক খেতে খেতে কথা বলেন। বদরুল সাহেব খুব উসখুস করছেন। আমি চুপচাপ বসে আছি। ইয়াকুব আলি এক ফাঁকে আমাদের দিকে একটু তাকাতেই বদরুল সাহেব বললেন, ইয়াকুব, ইনি হচ্ছেন আমার ফ্রেন্ড, হিমু সাহেব, উনাকে সাথে করে এনেছি।

ইয়াকুব আলি আমার দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গিতে হেসে বললেন, চা চলবে? বলেই ইন্টারকমে কাকে খুব ধমকাতে লাগলেন।

আমরা ধমকপর্ব শেষ হবার জন্যে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম। এক সময় ধমকপর্ব শেষ হল। ইয়াকুব আলি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, এ কি, এখনো চা দেয়নি? বলেই কর্কশ শব্দে বেল বাজাতে লাগলেন। কিংবা কে জানে বেল হয়ত মধুর শব্দেই বাজল, তবে আমার কানে কর্কশ লাগলো।

বদরুল সাহেব বললেন, চা লাগবে না ইয়াকুব।

'অবশ্যই চা লাগবে। তুমি তোমার বন্ধু নিয়ে এসেছ। ফার্স্ট মিটিং, চা লাগবে না মানে? তারপর বল কি ব্যাপার?'

বদরুল অস্বস্তির সঙ্গে বলল, তুমি আজ আসতে বলেছিলে।

'ও আচ্ছা, আজকে আসতে বলেছিলাম?'

'আমার একটা চাকরির ব্যাপারে। তুমি বলেছিলে ব্যবস্থা করবে।'

ইয়াকুব আলি হাসিমুখে বলল, বলেছি যখন তখন অবশ্যই করব। স্কুল-জীবনের বন্ধুর সামান্য উপকার করব না তা তো হয় না। বায়োডাটা তো দিয়ে গিয়েছ?

'হ্যাঁ। দু'বার দিয়েছি।'

'আমি দেখেছি। দেখ বদরুল, আপাতত কিছু করা যাচ্ছে না। নো অপেনিং। যে

সব অপেনিং আছে তোমাকে তা দেয়া যায় না। তুমি নিশ্চয়ই পিয়নের চাকরি করবে না। হা হা হা।'

বদরুল সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন, তুমি আজকের কথা বলেছিলে। আমার অবস্থা খুবই ভয়াবহ।

ইয়াকুব দার্শনিক ভাব ধরে ফেলে বলল, অবস্থা তো শুধু তোমার একার ভয়াবহ না, পুরো জাতির অবস্থাই ভয়াবহ। বিজনেস বলতে কিছু নেই। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান লসে রান করছে। বাইরে থেকে সেটা বোঝা যায় না।

'ইয়াকুব, আমি তোমার উপর ভরসা করে এসেছিলাম . . . '

'ভরসা নিশ্চয়ই করবে। ভরসা করবে না কেন? আমি কি করব তোমাকে বলি — আমি আমার বিজনেস কসমেটিক্স লাইনে এক্সপান্ড করছি। আমি মনে মনে ডিসাইড করে রেখেছি — তোমাকে সেখানে ম্যানেজারিয়েল একটা পোস্ট দেব।'

'সেটা কবে?'

'একটু সময় নেবে। মাত্র জমি কেনা হয়েছে। লোনের জন্যে এপ্লাই করেছি। বিদেশী কোন ফার্মের সঙ্গে কোলাবরেশানে যাব। ফ্যাক্টরী তৈরি হবে — তারপর কাজ। তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। সবুরে মেওয়া ফলে। এটা মনে রাখবে।'

বদরুল সাহেবের হতভম্ব মুখ দেখে আমার নিজেরই মায়া লাগছে। আহা বেচারা! সে বোধহয় জীবনে এত অবাক হয়নি। এসি বসানো ঠাণ্ডা ঘরেও ঘামছে।

চা চলে এসেছে। ইয়াকুব সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সিগারেট কি চলে নাকি ভাই? তিনি আমাদের দিকে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন। আমি সিগারেট নিতে নিতে বললাম, বদরুল সাহেবকে চাকরিটার জন্যে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?

ইয়াকুব সাহেব সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন — এগজ্যাক্ট বলা মুশকিল। তিন-চার বছর তো বটেই। বেশিও লাগতে পারে।

আমি সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিলাম। চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। হাসিমুখে বললাম, ভাই শুনুন, চাকরি আপনার পক্ষে দেয়া সম্ভব না এই কথাটা সরাসরি আপনার বন্ধুকে বলে দিচ্ছেন না কেন? বলতে অসুবিধা কি? চক্ষুলজ্জা হচ্ছে? আপনার মত মানুষের তো চক্ষুলজ্জা থাকার কথা না।

ইয়াকুব আলি চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। ঠাণ্ডা মাথায় আমাকে বোঝার চেষ্টা করছেন। আমার ক্ষমতা যাচাইয়ের একটা চেষ্টাও আছে।

বদরুল সাহেব বললেন, হিমু ভাই, চলুন যাই।

আমি বললাম, চা-টা ভাল হয়েছে, শেষ করে তারপর যাই।

ইয়াকুব আলি এখনো তাকিয়ে আছেন। তাঁর হাত টেলিফোনের উপর। আমি তাঁর দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললাম, আপনি কি আমাকে ভয় পাচ্ছেন? ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি নিরীহ একজন মানুষ। আমি যা করতে পারি তা হচ্ছে — আপনার মুখে

থু-থু ফেলতে পারি। এতে আপনার কিছু হবে না। কারণ প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ আপনার মুখে অদৃশ্য থু-থু ফেলছে। আপনি এতে অভ্যস্ত। থু-থু না ফেললেই বরং আপনি অবাক হবেন।

বদরুল সাহেব হাত ধরে আমাকে টেনে তুলে ফেললেন। চাপা গলায় বললেন, হিমু ভাই, কি পাগলামি করছেন?

ইয়াকুব সাহেব তাকিয়ে আছেন। রাগে তাঁর হাত কাঁপছে। সম্ভবত কি করবেন সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললাম, ভাই, আপনি আমাকে ভাল করে চিনে রাখুন। আমার নাম হিমু। আমি কাউকে সহজে ছেড়ে দেই না। আপনাকেও ছাড়ব না।

বদরুল সাহেব আমাকে টেনে ঘর থেকে বের করে ফেললেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আমি বললাম, বদরুল সাহেব, আপনি মেসে চলে যান। আমি একটা কাজ সেরে মেসে আসছি। তারপর দু'জন একসঙ্গে আপনার দেশে রওনা হয়ে যাব।

'আমার সঙ্গে তো টাকাপয়সা কিছুই নাই।'

'একটা ব্যবস্থা হবেই। আপনার কি মেসে ফিরে যাবার মত রিকশা ভাড়া আছে?

'জ্বি না।'

'আমার কাছেও নেই। পকেট-নেই পাঞ্জাবি আজও পরে চলে এসেছি। আপনি হেঁটে হেঁটে চলে যান। চিটাগাংয়ের রাতের ট্রেন ক'টায়?

'সাড়ে দশটায়।'

'রাত দশটার আগে আমি অবশ্যই পৌঁছে যাব।'

বদরুল সাহেব পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, কি ইচ্ছা করছে জানেন হিমু ভাই? ইচ্ছা করছে একটা চলন্ত ট্রাকের সামনে লাফ দিয়ে পড়ে যাই।

'ট্রাকের সামনে লাফ দিয়ে পড়তে হবে না। আপনি মেসে চলে যান, আমি আসছি।'

'হিমু ভাই, আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না।'

আমি লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোক সত্যি হাঁটতে পারছেন না। পা কাঁপছে। মাতালের মত পা ফেলছেন।

আমি বললাম, চলুন, আপনাকে মেসে পৌঁছে দিয়ে তারপর যাই, আমার কাজটা সেরে আসি। হাত ধরুন তো দেখি।

'দেশে গিয়ে আমি আমার স্ত্রীকে কি বলব? মেয়েগুলিকে কি বলব?'

'কিছু বলতে হবে না। এদের জড়িয়ে ধরবেন। এতেই তারা খুশি হবে। ভাই, চোখ মুছুন তো।'

আমি বদরুল সাহেবকে মেসে নামিয়ে দিয়ে গেলাম রূপার কাছে। আমি নিশ্চিত

সে একটা ব্যবস্থা করে রেখেছে। আমি তার হাত থেকে এপয়েন্টমেন্ট লেটারটা নেব। হাজারখানিক টাকা নেব। কিছু মিষ্টি কিনব। বদরুল সাহেবের ছোট মেয়েটার জন্যে একটা বাংলা ডিকশনারি কিনব। মেয়েটা বড্ড বানান ভুল করে। 'মুখস্থ'-র মত সহজ বানান ভুল করলে চলবে কেন? এইসব উপহার নিয়ে রাতের ট্রেনে রওনা হব বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধু-পত্নীর মেথি দিয়ে রাঁধা মাংস খেতে হবে। মাছের পোনা পাওয়া গেলে সজনে পাতা এবং পোনার বিশেষ প্রিপারেশন।

রূপাকে বাড়িতে পেলাম না। সে কোথায় কেউ বলতে পারল না। কখন ফিরবে তাও কেউ জানে না। দুপুরে বেরিয়েছে, আর আসেনি।

রাত ন'টা পর্যন্ত আমি রূপাদের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। বদরুল সাহেব অপেক্ষা করে থাকবেন। তাঁর স্ত্রীর কাছে তাঁকে পৌঁছানো দরকার। সঙ্গে একটা পয়সা নেই। ফিরে গেলাম মেসে। কোন একটা ব্যবস্থা কি হবে না?

মেসের ম্যানেজার আমাকে আসতে দেখে ছুটে এল। তার ছুটে আসার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে বিশেষ কিছু ঘটেছে। সেই বিশেষ কিছুটা কি? দুঃসংবাদ না সুসংবাদ? রূপা কি মেসে আমার জন্যে এপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে অপেক্ষা করছে, না-কি বদরুল আলম ভয়ংকর কোন কাণ্ড করে বসেছেন? সিলিং ফ্যানে ঝুলে পড়ছেন?

ম্যানেজার হড়বড় করে বলল, স্যার, আপনি মেডিকেল কলেজে চলে যান!

'কেন?'

'বদরুল সাহেবের অবস্থা খুবই খারাপ।'

'কি হয়েছে?'

চুপচাপ বসেছিলেন। তারপর খুব ঘামা শুরু করলেন। কয়েকবার আপনার নাম ধরে ডাকলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। আমরা দৌড়াদৌড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। এম্বুলেন্স পাওয়া যায় না, কিছু পাওয়া যায় না। রিকশায় করে নিতে হয়েছে, হাত-পা একেবারে ঠাণ্ডা।

আমি হাসপাতালের সিঁড়িতে চুপচাপ বসে আছি। রূপা তার কথা রেখেছে। এপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠিয়েছে। আমাকে না পেয়ে ইরার হাতে দিয়ে এসেছে। ইরা সেই চিঠি নিয়ে প্রথমে গেছে আমার মেসে। সেখানে সব খবর শুনে একাই রাত এগারটার দিকে এসেছে হাসপাতালে।

বদরুল সাহেবের জন্যে খুব ভাল একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছে রূপা। আট হাজার টাকার মত বেতন। কোয়ার্টার আছে। বেতনের সাত পার্সেন্ট কেটে রাখবে কোয়ার্টারের জন্যে। রাত বারটার দিকে বদরুল সাহেবের অবস্থা কি খোঁজ নিতে গেলাম। ইরাও এল আমার সঙ্গে সঙ্গে। ডাক্তার সাহেব বললেন, অবস্থা ভাল না। জ্ঞান ফিরেনি।

'জ্ঞান ফেরার সম্ভাবনা কি আছে?'

'ফিফটি-ফিফটি চান্স।'

আমি বললাম, ডাক্তার সাহেব, এটা একটা এপয়েন্টমেন্ট লেটার। আপনার কাছে রাখুন। যদি জ্ঞান ফিরে উনার হাতে দেবেন। যদি জ্ঞান না ফিরে ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলবেন।

আমি হাসপাতাল থেকে বের হচ্ছি। এখন কাঁটায় কাঁটায় রাত বারটা — জিরো আওয়ার। আমার রাস্তায় নেমে পড়ার সময়। ইরা বলল, কোথায় যাচ্ছেন?

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, কোথাও না। রাস্তায় রাস্তায় হাঁটবো।

'আপনার বন্ধুর পাশে থাকবেন না?'

'না।'

ইরা নিচু গলায় বলল, হিমু ভাই, আমি কি আপনার সঙ্গে হাঁটতে পারি? শুধু একটা রাতের জন্যে?

আমি বললাম, অবশ্যই পার।

ইরা অস্পষ্ট স্বরে বলল, আপনাকে যদি বলি আমার হাত ধরতে, আপনি রাগ করবেন?

আমি শান্ত গলায় বললাম, আমি রাগ করব না। কিন্তু ইরা, আমি তোমার হাত ধরব না।

হিমুরা কখনো কারো হাত ধরে না।
